বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

অষ্টম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১২ শিক্ষাবর্ষ থেকে
অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

অষ্টম শ্রেণি

রচনায়

প্রফেসর মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী
অধ্যাপক ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন
অধ্যাপক ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ
অধ্যাপক ড. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন
ড. সেলিনা আখতার
ফাহ্‌মিদা হক
ড. উত্তম কুমার দাশ
আনোয়ারুল হক
সৈয়দা সঙ্গীতা ইমাম

সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন
অধ্যাপক শফিউল আলম
আবুল মোমেন
অধ্যাপক ড. মাহবুব সাদিক
অধ্যাপক ড. মোরশেদ শফিউল হাসান
অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক
সৈয়দ মাহফুজ আলী

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১১
পুনর্মুদ্রণ : ২০১২

গ্রন্থ রচনায় সমন্বয়ক

দিলরুবা আহমেদ
পারভেজ আক্তার
তাহমিনা রহমান

কম্পিউটার কম্পোজ
পারফর্ম কালার গ্রাফিক্স (প্রা.) লিঃ

প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কন
সুদর্শন বাছার
সুজাউল আবেদীন

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ–কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা ছাড়া আত্মনির্ভরশীল, দক্ষ ও মর্যাদাসম্পন্ন জাতি–গঠন সম্ভব নয়। এই প্রত্যয় ও প্রণোদনা থেকেই জাতীয় শিক্ষানীতি–২০১০ প্রণীত হয়। উক্ত শিক্ষানীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে নতুন এক জীবনাকাঙ্ক্ষা ও জীবন বাস্তবতার পটভূমিতে রচিত হয় নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের নতুন শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে প্রণীত এই শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যকে যথাযথভাবে অষ্টম শ্রেণির **বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়** শীর্ষক পাঠ্যপুস্তকটিতে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে রচিত এই পাঠ্যপুস্তকটির বিষয়বস্তু নতুন আঙ্গিক ও কৌশলে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে সমাজ বিজ্ঞান, ইতিহাস, পৌরনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল ও জনসংখ্যার বিষয়গুলো স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপনের পরিবর্তে সমন্বিতভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থী কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ের সার্বিক অবস্থা অর্থাৎ ঐ সময়ের বাংলাদেশ ও বিশ্ব প্রেক্ষিত সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভ করবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা এদেশের ইতিহাস–ঐতিহ্য, শিল্প–সংস্কৃতি, নীতি–নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে এবং এই জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন, মুক্তিযুদ্ধের মহান অর্জন, দেশপ্রেম, মানবতাবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ ও বিজ্ঞান–চেতনা ইত্যাকার অতীব তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় নিয়ে ভাববার সুযোগ পাবে। সুস্থ চিন্তার চর্চা ও পরিচ্ছন্ন জীবনবোধ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলাই এই আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এছাড়া জাতীয় প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রচুর পাঠের ভার থেকে শিক্ষার্থীদের মুক্ত করে স্বল্প ও সুন্দর আয়োজনের মধ্যে তাদের আনন্দিত বিচরণ নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে মূল্যায়নকে আরও ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সুধীজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে ও সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায়শেষে অনুশীলনের জন্য নমুনা হিসাবে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং তারা অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে এবং যেকোনো বিষয়কে বিচার–বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে পারবে। এছাড়া প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বাস্তব জীবনোপযোগী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার জন্য বিচিত্র কাজের আয়োজন রাখা হয়েছে। 'অনুশীলনমূলক কাজ' নামে অনুশীলনের এই অংশে শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত দক্ষতা, সৃজনশীলতা, রুচি ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দিতে পারবে। গ্রন্থটিতে বানানের ক্ষেত্রে সর্বত্র অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি পরীক্ষামূলক সংস্করণ হিসাবে প্রকাশিত হলো।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকটির আরও সমৃদ্ধিসাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করাতে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকটি আরও সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, সৃজনশীল প্রশ্ন ও অনুশীলনমূলক কাজ প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম ও পরিচ্ছেদ	পাঠ	পাঠ শিরোনাম	পৃষ্ঠা
এক	ঔপনিবেশিক যুগ ও বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম	১	বহিরাগত শাসকদের অধীনে বাংলাদেশ	১
		২	ইউরোপীয় শক্তির বিকাশ	১
		৩	বাংলায় উপনিবেশিক শক্তির বিজয়ের কারণ	৩
		৪	বাংলায় ইংরেজ শক্তির উত্থান	৪
		৫	বাংলায় ব্রিটিশ শাসন (১৯৫৮–১৯৪৭ খ্রি.)	৬
		৬	বাংলায় নবজাগরণ	৭
		৭	ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি	৮
দুই	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ	১	মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি	১০
		২	৭ই মার্চ ভাষণের বৈশিষ্ট্য	১২
		৩	গণহত্যার প্রস্তুতি	১৪
		৪	বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা	১৫
		৫	মুজিবনগর সরকার	১৬
		৬	মুক্তিবাহিনী গঠন ও কার্যক্রম	১৭
		৭	মুক্তিযুদ্ধে বিরোধী শক্তির তৎপরতা ও ভূমিকা	১৯
		৮	প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা	২১
		৯	মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের ভূমিকা	২৪
		১০	যৌথ বাহিনীর নেতৃত্বে চূড়ান্ত যুদ্ধ	২৫
		১১	গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ	০০
		১২	পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ	২৭
তিন	বাঙালির সংস্কৃতি ও শিল্পকলা	১	দৃশ্যশিল্প	৩০
		২	সাহিত্যশিল্প	৩১
		৩	সঙ্গীতশিল্প	৩২
		৪	প্রতিষ্ঠান	৩৩
চার	ঔপনিবেশিক যুগের প্রত্নপরিচয়	১	ঢাকা শহরের প্রত্নানিদর্শন	৩৭
		২	ঢাকার বাইরের স্থাপত্য–নিদর্শন	৩৮
		৩	জাদুঘরে সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদ	৩৯
পাঁচ	সামাজিকীকরণ ও উন্নয়ন	১	সামাজিকীকরণে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রভাব	৪২
		২ ও ৩	ব্যক্তির সামাজিকীকরণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং গণমাধ্যমের ভূমিকা	৪৩

ছয়	বাংলাদেশের অর্থনীতি	১ ২ ৩ ৪	উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে বিভিন্ন খাতের অবদান মানবসম্পদ উন্নয়ন বাংলাদেশের অর্থনীতি ও প্রবাসীদের আয়	৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯
সাত	বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা	১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ও ৮	সরকারের ধরন বাংলাদেশের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গের কাজ স্থানীয় সরকার স্থানীয় সরকারের কাজ	৫২ ৫৪ ৫৬ ৫৬ ৫৮ ৫৯ ৬১
আট	বাংলাদেশের দুর্যোগ	১ ও ২ ৩ ৪ ও ৫ ৬,৭ ও ৮	বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, কারণ ও প্রভাব দুর্যোগের ধারণা ও ধরন বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দুর্যোগ মোকাবেলায় করণীয়	৬৫ ৬৮ ৬৯ ৭১
নয়	বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও উন্নয়ন	১ ও ২ ৩ ৪ ও ৫	বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বেসরকারি উদ্যোগ জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা	৭৯ ৮০ ৮১
দশ	বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা	১ ২ ৩ ৪	কিশোর অপরাধের ধারণা ও কারণ কিশোর অপরাধের প্রভাব ও প্রতিরোধ মাদকাসক্তির কারণ মাদকাসক্তির প্রভাব ও প্রতিরোধ	৮৪ ৮৫ ৮৭ ৮৭
এগার	বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬	বাংলাদেশের বিভিন্নক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভৌগোলিক অবস্থান চাকমা গারো সাঁওতাল মারমা রাখাইন	৯১ ৯৩ ৯৫ ৯৭ ০০ ৯৯
বার	বাংলাদেশের সম্পদ	১ ২ ৩ ৪ ৫	বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ আর্থ–সামাজিক অগ্রগতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের ভূমিকা বাংলাদেশে জীববৈচিত্র্য বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্প বাংলাদেশের আর্থ–সামাজিক উন্নয়নে শিল্প	১০২ ১০৩ ১০৪ ১০৫ ১০৭
তের	বাংলাদেশ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থা	১ ও ২ ৩ ৪ ও ৫	জাতিসংঘ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা আঞ্চলিক সহযোগী সংস্থা	১১১ ১১৬ ১১৮

অধ্যায়–এক

ঔপনিবেশিক যুগ ও বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম

পাঠ –১ : বহিরাগত শাসকদের অধীনে বাংলাদেশ

পাল রাজাদের পর বাংলায় যে সেন বংশ রাজত্ব শুরু করেছিল তারা স্থানীয় মানুষ ছিল না। সেনরা এসেছিল দক্ষিণ ভারত থেকে। সেই থেকে বাংলার শাসনক্ষমতা চলে গিয়েছিল বাইরের মানুষের হাতে। সেনদের হটিয়ে দিয়ে বাংলা দখল করেছিলেন ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি। তিনি ছিলেন ভাগ্যান্বেষী তুর্কি সেনাপতি। সেই থেকে বাংলার সাথে তুর্কি যোগাযোগ। আর সেই সূত্রে ইসলাম ধর্ম ও বৃহত্তর পারস্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসে বাংলা। ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ বাংলায় স্বাধীন সুলতানি প্রতিষ্ঠা করেন যা দুশ বছর স্থায়ী হয়েছিল। তবে সুলতানরা কেউই কিন্তু বাঙালি ছিলেন না। তাদের সূত্রে বাংলার রাজদরবারের ভাষা হয় ফার্সি যা ইংরেজদের ক্ষমতা দখলের পরও বেশ কিছুকাল বহাল ছিল। এরপর দিল্লির মোগল সম্রাট আকবরের সেনাপতি মানসিংহ যুদ্ধ জয় করে বাংলাকে দিল্লির সুবা বা প্রদেশে পরিণত করেন। তবে তখনো পূর্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গে ঈসা খান, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য প্রমুখ ইতিহাস-খ্যাত বারভুঁইয়ার রাজত্ব ও প্রভাব বহাল ছিল। তাঁরা প্রায় সবাই ভারতের বিভিন্ন অংশে মোগলদের হাতে পর্যুদস্ত পাঠান, রাজপুত বংশের সামন্ত শাসক ছিলেন, বাঙালি ছিলেন না।

বাংলা থেকে পুঁজি পাচারের সূচনা

দিল্লিতে আকবরের পরে তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর মসনদে বসার পর বাংলার সাথে দিল্লির সম্পর্কে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে। যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াও শিল্প-সাহিত্য ও বিলাস-বিনোদনের জন্যে তিনি বাংলার কোষাগার থেকে টাকা ও সম্পদ নিতে শুরু করেন। শেষের দিকে ১৬৭৮ সালে সুবেদার শায়েস্তা খান একবারে নগদ ৩০ লাখ টাকা ও ৪ লাখ টাকা মূল্যের সোনা পাঠান দিল্লিতে। এই ধারা পরবর্তী সময়ে কেবল বেড়েছে। সুবেদার সুজাউদ্দিন তাঁর ১১ বছরের সুবেদারির সময়ে দিল্লিতে প্রায় ১৪ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা পাঠান। এখনকার বাজার দরে এই টাকার মূল্য কত হতে পারে একবার আন্দাজ কর। এভাবে বহুকাল ধরে বাংলা থেকে ব্যাপক হারে অর্থ ও সম্পদ বাইরে চলে যায়। একে অর্থনীতির ভাষায় বলা যায় পুঁজি পাচার।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : বাংলার রাজদরবারের ভাষা ফার্সি হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

কাজ–২ : বাংলা থেকে পুঁজি পাচারের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ কর।

পাঠ–২ : ইউরোপীয় শক্তির বিকাশ

আমরা জানি, ইউরোপের কোনো কোনো দেশে খনিজ সম্পদের আবিষ্কার, সামুদ্রিক বাণিজ্যের বিস্তার এবং কারিগরি ও বাণিজ্যিক বিকাশের ফলে অর্থনীতি তেজি হয়ে উঠেছিল। এর ফলে চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ইউরোপে যুগান্তকারী বাণিজ্য-বিপ্লবের সূচনা হয়। তখন একদিকে তাদের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সংগঠনগুলো শক্তিশালী হতে শুরু করে আর অন্যদিকে কাঁচামাল ও উৎপাদিত সামগ্রীর জন্যে বাজারের সন্ধানও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে।

১৪৯৯ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে পৌঁছে ভারতবর্ষকে বিশ্ব-বাণিজ্য বিস্তারের প্রতিযোগিতার মধ্যে নিয়ে আসেন। আর দক্ষ নাবিক আল বুকার্ক ভারত মহাসাগরের কর্তৃত্ব অধিকার করে এক কথায় পুরো ভারতের বহির্বাণিজ্য করায়ত্ত করে নেন।

১৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ইউরোপের যুদ্ধরত বিভিন্ন দেশের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি হয়। একে বলে ওয়েস্টফালিয়ার চুক্তি। এটি সম্পাদিত হওয়ার পর শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি নতুন উদ্যমে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। এদের অধিকাংশের লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষ। আবার তার মধ্যে বাংলার সিল্ক ও অন্যান্য মিহি কাপড় এবং মসলা তাদের প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠে। এতে বহুকাল পর বাংলার বাণিজ্যখাতে বেশ রমরমা ভাব দেখা দেয়। ১৬৮০—৮৩ এই চার বছরে শুধু ইংল্যান্ড থেকে বাংলার রপ্তানি আয় দাঁড়ায় দুই লক্ষ পাউন্ড বা তৎকালীন হিসাবে আঠার লক্ষ টাকা।

বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের আগমন

পুঁজির জোর আর উন্নত কারিগরি জ্ঞানের সমন্বয় করে ক্রমে বিদেশি বণিকরা এদেশে স্থানীয় শ্রমিকদের খাটিয়ে বড় বড় শিল্পকারখানা স্থাপন করে প্রচুর মুনাফা করতে থাকে। ক্রমে পর্তুগিজদের চেয়ে ব্যাপক হয়ে দাঁড়ায় এদেশে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের ভূমিকা। এছাড়া ফরাসি, ওলন্দাজ ও দিনেমাররাও বাংলায় কারখানা স্থাপন করে ব্যবসা করেছে। এই বিদেশিদের বিনিয়োগ ও ব্যবসা কেমন ছিল তার কিছুটা হদিস মিলবে বিদেশি পর্যটকদেরই বর্ণনায়। ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ের ১৬৬৬ সালে লিখেছেন, 'ওলন্দাজরা তাদের কাশিমবাজারের সিল্ক ফ্যাক্টরিতে কখনো কখনো ৭ থেকে ৮শ লোক নিয়োগ করত।' ইংরেজ ও অন্যান্য জাতির বণিকরাও এরকম কারখানা চালাত। বার্নিয়ের আরও লিখেছেন, 'শুধুমাত্র কাশিমবাজারে বছরে ২২ হাজার বেল সিল্ক উৎপাদিত হয়।'

এভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে ইউরোপের বণিকরা দেখল বাংলায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেই সবচেয়ে বেশি ফায়দা উসুল সম্ভব। এ সময় কলকাতা, চন্দননগর, চুঁচুড়া, কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানে ইউরোপীয় বাণিজ্যকেন্দ্রগুলো ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে। আর এদের মাধ্যমে বাংলা থেকে পুঁজিও পাচার হতে থাকে। পলাশি যুদ্ধের আগে এবং মীর জাফর ও মীর কাশিমের আমলে বাংলার প্রচুর সম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার হয়ে যায়। এ সম্পদের প্রাচুর্যের কথা স্বয়ং ক্লাইভ ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে সবিস্ময়ে উল্লেখ করেছিলেন।

১৬৮২ সালে বাংলার ইংরেজ কোম্পানিগুলোর গভর্নর হিসাবে উইলিয়াম হেজেজ হুগলিতে আসেন। সুবেদার শায়েস্তা খানের বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের দুর্নীতির ফলে তাদের ব্যবসায়ের ক্ষতি সরেজমিনে দেখে তিনি ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় জেমসকে বুঝিয়ে ১৬৮৬ সালে স্বদেশ থেকে সৈন্য এনে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। ১৬৮৭ থেকে ১৬৯০ পর্যন্ত ইংরেজদের সাথে মোগল শক্তির বেশ কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধ হয় এবং শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা তাদের ব্যবসায়িক সুবিধা আদায় করে এক ঢিলে দুই পাখি মারে। তারা এখানে তাদের কুঠি ও কারখানা তৈরির এবং সৈন্য রেখে ব্যবসার অধিকার পায়। আবার সাথে সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য ইউরোপীয় শক্তির উপর প্রাধান্য লাভ করে।

প্রজাদের শোষণ-বঞ্চনা

বাংলা থেকে যখন পুঁজি পাচার শুরু হয় তখন থেকে প্রজাদের উপর শোষণ-নিপীড়ন অনেক বেড়েছে। এ কারণেই আমরা মোগল আমলে, বিশেষভাবে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় থেকে, বাংলায় ঘন ঘন কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হতে দেখি। সুবেদার শায়েস্তা খানের আমলে জিনিসপত্রের শস্তা দামের কথা আমরা শুনি বা বইপত্রে পড়েছি। কিন্তু তখন সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে তাদের ক্রয়ক্ষমতা বলে আসলে কিছুই ছিল না। তাই চালসহ নিত্যব্যবহার্য জিনিস বা গরু–ছাগলের দাম অবিশ্বাস্য রকম কম হলেও তা প্রজাদের কোনো উপকারে আসে নি। শায়েস্তা খানের নিজের অর্থলিপ্সা এত প্রচণ্ড ছিল যে এক ইংরেজ ব্যবসায়ী ১৬৭৬ সালে লিখেছেন, শায়েস্তা খানের কর্মচারীরা সাধারণ মানুষকে এমন শোষণ করত যে, এমনকি পশুখাদ্যের (মূলত ঘাস) ব্যবসাও তাদের একচেটিয়া ছিল। আর এক ব্যবসায়ী জানাচ্ছেন, ১৩ বছর বাংলার সুবেদার থেকে শায়েস্তা খান যে পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছিলেন তা তখনকার বিশ্বে বিরল। তিনি ছিলেন অন্ততপক্ষে ৩৮ কোটি টাকার মালিক এবং তাঁর দৈনিক আয় ছিল দুই লক্ষ টাকা!

এদিকে পশ্চিম ভারতে মারাঠা শক্তির উদ্ভব হলে এরাও বাংলায় হামলা চালাতে থাকে। হামলাকারী মারাঠা বর্গিদের নিয়ে জনমনে আতঙ্ক কত গভীর ছিল তা একটি গ্রাম্য ছড়া থেকে বোঝা যায়। বাংলার মা শিশু-সন্তানকে ঘুম পাড়াতে আজও ছড়া কাটেন–'ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো / বর্গি এলো দেশে।' একদিকে ইংরেজ বণিকদের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও ধূর্ত চাল আর অন্যদিকে বর্গির হামলায় বিপর্যস্ত বাংলাকে রেখেই মারা যান বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দী খান।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : যেসব ইউরোপীয় শক্তি ভারতবর্ষে আগমন করে তাদের তালিকা তৈরি কর।

কাজ–২ : সে সময়ে এ দেশের প্রজাদের অবস্থার পরিচয় তুলে ধর।

পাঠ –৩ : বাংলায় ঔপনিবেশিক শক্তির বিজয়ের কারণ

আলিবর্দীর মৃত্যুর পর তাঁর প্রিয় নাতি সিরাজউদ্দৌলা মাত্র ২২ বছর বয়সে যখন সিংহাসনে বসলেন তখন তাঁর সামনে একদিকে উদীয়মান ইংরেজ শক্তি ও হামলাকারী বর্গিদের সামলানোর কঠিন কাজ আর অন্যদিকে বড় খালা ঘসেটি বেগম ও সিপাহসালার মীর জাফর আলী খানের মতো ঘনিষ্ঠজনদের ষড়যন্ত্র মোকাবিলার কাজ। সিরাজের বিরুদ্ধে তৃতীয় আরেকটি পক্ষও কাজ করেছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তার ঘটার সাথে সাথে ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রগুলোতে ক্ষমতালোভী ভারতীয় বণিকসমাজের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলায় রাজপুতনা থেকে আগত মারওয়াড়িরা এই ক্ষমতাবান বণিক। তারাও ব্যবসায়িক স্বার্থে ইংরেজ বণিকদের পক্ষে যোগ দেয় ও বাংলার নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এরই ফল হলো পলাশির যুদ্ধে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবের পরাজয় ও নির্মম মৃত্যু এবং ইংরেজদের হাতে বাংলার পতন। এভাবে শুরু হলো বাংলার ইতিহাসে প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসনের কাল। এবার একটু পিছন ফিরে আমরা বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসনের কারণগুলো আরেকবার স্মরণ করি।

১. দুশ বছরের স্বাধীন সুলতানি আমল ছাড়া বহিরাগত শাসকদের দীর্ঘ শাসনকালে বাংলার সাধারণ মানুষ চরম অর্থনৈতিক শোষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। তারা শাসকদের প্রতি বিমুখ ও উদাসীন ছিল। ফলে ইংরেজ আক্রমণে নবাবের পতন বা স্বাধীনতার অবসান সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা বা আগ্রহ ছিল না।

২. দীর্ঘকাল ধরে পুঁজি পাচারের ফলে বাংলার দারিদ্র্য ও গ্রামসমাজের স্থবিরতা এতই প্রকট ও গভীর ছিল যে বাণিজ্য বিস্তারের ফলে সৃষ্ট নতুন সুযোগ কাজে লাগানোর মতো উদ্দীপনা তাদের মধ্যে ছিল না।

৩. উদীয়মান অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি হিসাবে ইংরেজদের উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধি, তাদের ধূর্ত পরিকল্পনা বোঝার মতো কোনো রাজনৈতিক সামাজিক শক্তি দেশে ছিল না।

৪. বাংলার শাসকদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও চক্রান্ত এত গভীর ছিল যে তরুণ অনভিজ্ঞ সিরাজের পক্ষে তা মোকাবিলা করা সম্ভব হয় নি।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ– ১ : বাংলায় বহিরাগতদের শাসনের বর্ণনা দাও।

পাঠ – ৪ : বাংলায় ইংরেজ শক্তির উত্থান

বাণিজ্য বিস্তারের যুগে ইউরোপের প্রভাবশালী নৌ-শক্তির অধিকারী দেশগুলো সম্পদের সন্ধানে বহির্বিশ্বে বেরিয়ে পড়ে। তাদের অধিকাংশের লক্ষ্য ছিল পূর্ব দেশসমূহ, বিশেষত ভারতবর্ষ। এই উদ্দেশ্য থেকেই ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে স্থাপিত হয় দি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং ১৬৫১ সালে হুগলিতে ও ১৬৫৮ সালে কাশিমবাজারে তারা বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। ডাচ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬৩০ সালে বাংলায় প্রবেশ করলেও ইংরেজ কোম্পানির সাথে টিকে থাকতে না পেরে কিছুকাল পরে ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়ার দিকে চলে যায়। ফ্রেঞ্চ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে ফরাসিরা ১৬৬৪ সালে বাংলায় প্রবেশ করে এবং চন্দননগর ও চুঁচুড়ায় শক্ত ঘাঁটি গড়ে তোলে। তবে ইংরেজদের সাথে তিন দফা যুদ্ধে হেরে তারাও প্রায় একশ বছরের বাণিজ্য গুটিয়ে ইন্দোচীনের দিকে চলে যায়।

দি ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ধীরে ধীরে এদেশে তাদের প্রতিপত্তি বাড়িয়ে নবাবের দরবারে প্রভাব বিস্তারের মতো ক্ষমতা ভোগ করতে শুরু করে। ১৭৫৬ সালে আলিবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর ক্ষমতার উত্তরাধিকার নিয়ে নবাব পরিবার এবং রাজপ্রাসাদের অভিজাতদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব শুরু হয় কোম্পানির কর্তারা তার সুযোগ নিতে কসুর করে নি। তরুণ নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে তাঁর খালা ঘসেটি বেগম, মীর জাফর, মীর কাসিমসহ রাজদরবারের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ এবং উমিচাঁদ, জগত শেঠ ও রাজ বল্লভদের মতো তৎকালীন ধনী অভিজাতদের একটি অংশ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে ইংরেজ বণিকরা তাদের সাথে যোগ দেয়। এই সুযোগে মাদ্রাজ থেকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে এসে ইংরেজ সেনাপতি ওয়াটসন ও ক্লাইভ কলকাতা দখল করে নেয়। এরপর নবাবের রাজধানী মুর্শিদাবাদ দখল করতে ক্লাইভ পলাশির আম্রকাননে উপস্থিত হয়। ১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন সেই যুদ্ধে প্রবীণ সেনাপতি মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলার

পরাজয় ঘটে। নবাবকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বিজয়ের পর মীর জাফরকে নবাব বানালেও মূল ক্ষমতা চলে যায় ধূর্ত ও দুর্ধর্ষ ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভের হাতে। শেষ পর্যন্ত ১৭৬৫ সালে ক্লাইভ দিল্লির সম্রাটের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন।

বাংলায় কোম্পানি শাসন

দেওয়ানি লাভের পর এ বিস্তীর্ণ অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা ইংরেজের হাতে চলে যায়। প্রশাসনেও তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্লাইভ বাংলায় কিছুকাল দ্বৈতশাসন চালিয়ে যান। নিজেদের হাতে রাজস্ব ও প্রশাসন ধরে রেখে নবাবকে কার্যত ক্ষমতাহীন করে সিংহাসনে রাখেন। রাজস্বের দায়িত্ব পেয়ে ইংরেজরা প্রজাদের উপর অতিরিক্ত করের বোঝা চাপিয়ে তা আদায়ে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। এর উপর ১৭৬৮ সাল থেকে তিন বছরের অনাবৃষ্টির ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এটিই ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (বাংলা ১১৭৬ সন অনুযায়ী) নামে পরিচিত। এই দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা ছিল প্রায় এক কোটি, যা সেকালের বাংলার জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। তবে মৃতের প্রকৃত সংখ্যা যে তার চেয়েও বেশি ছিল তা বলাই বাহুল্য।

প্রথম পর্যায়ে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে উল্লেখযোগ্য গভর্নররা হলেন— ওয়ারেন হেস্টিংস, লর্ড কর্নওয়ালিস, লর্ড ওয়েলেসলি, লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক, লর্ড হার্ডিঞ্জ, লর্ড ডালহৌসি প্রমুখ। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার জন্য তারা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তাদের শাসন-শোষণের স্বার্থেই তারা কাজগুলো করলেও এসব কোনো কোনো কাজ থেকে এদেশবাসীও উপকৃত হয়েছে।

ইংরেজ শাসকদের প্রধান প্রধান কাজগুলো এখানে উল্লেখ করা হলো :

১. ১৭৮৬ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত ভারত শাসন আইনে বাংলায় ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেলের হাতে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা অর্পণ করা হয়।

২. ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করে ব্রিটিশদের অনুগত জমিদার শ্রেণি তৈরি করা হয়।

৩. রাষ্ট্র ও প্রশাসন পরিচালনায় ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়।

৪. মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় প্রশাসনিক বিভিন্ন দপ্তর, শিক্ষা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্থানান্তর করে এটিকে গুরুত্বপূর্ণ নগরীতে পরিণত করা হয়। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে কলকাতাই হয় বাংলার রাজধানী।

তবে এই সময়ে ইংরেজ গভর্নর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক ও লর্ড হার্ডিঞ্জ এদেশে শিক্ষা বিস্তারসহ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সূচনা করেন। এ ছাড়া সতীদাহ প্রথাসহ কিছু সামাজিক কুপ্রথা ও কুসংস্কার নিবারণে রাজা রামমোহন রায়ের মতো বাঙালিদের উদ্যোগকে তাঁরা সহযোগিতা দেন। এভাবে দেশে একটি নতুন শিক্ষিত শ্রেণি ও নাগরিক সমাজ গড়ে উঠলেও বৃহত্তর বাঙালি সমাজ ইংরেজ কোম্পানির শাসনে প্রকৃতপক্ষে শোষিত হয়েছে।

ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দখল পেয়েই ক্ষান্ত ছিল না। দিল্লিতে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্যে সংকট দেখা দেয়। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছোটবড়

নবাব ও দেশীয় রাজারা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। দিল্লির মসনদও দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে কোম্পানির সৈন্যবাহিনী নানা দিকে আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে।

১৮৫৭ সালে কোম্পানি শাসনের প্রায় একশ বছর পরে ইংরেজ অধ্যুষিত ভারতের বিভিন্ন ব্যারাকে সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। বাংলায় সিপাহী মঙ্গল পান্ডে ও হাবিলদার রজব আলী এ বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। সিপাহীদের এই বিদ্রোহে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের স্বাধীনচেতা শাসকরাও যোগ দেন। ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই, মহারাষ্ট্রের তাঁতিয়া টোপি এরকমই কয়েকজন। দিল্লির বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরও এদের সমর্থন জানিয়েছিলেন। কিন্তু উন্নত অস্ত্র ও দক্ষ সেনাবাহিনীর সাথে চাতুর্য ও নিষ্ঠুরতার যোগ ঘটিয়ে ইংরেজ এ বিদ্রোহ দমন করে। এরপর ১৮৫৮ সালের ২রা আগস্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত-শাসন আইন পাস হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কী? এর কারণ ব্যাখ্যা কর।

পাঠ – ৫ : বাংলায় ব্রিটিশ শাসন (১৮৫৮–১৯৪৭ খ্রি.)

ভারত শাসন আইন জারির ফলে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে। ভারতের রাষ্ট্র ক্ষমতা ব্রিটিশ রাজের হাতে ন্যস্ত হয়। এর ফলে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা কর্তৃক একজন মন্ত্রীকে ভারত–সচিব পদে (Secretary of State for India) মনোনীত করা হয়। যিনি ১৫ সদস্যবিশিষ্ট পরামর্শক সভা বা কাউন্সিলের মাধ্যমে ভারত শাসনের ব্যবস্থা করবেন। এই আইন অনুসারে গভর্নর জেনারেলকে ভাইসরয় বা ব্রিটিশ রাজ প্রতিনিধি নামে অভিহিত করা হয়। লর্ড ক্যানিং প্রথম ভাইসরয় নিযুক্ত হন। এভাবেই ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ১৮৬১ সালে ভারত সরকারকে বাংলায় প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভা স্থাপন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। বঙ্গীয় আইনসভা প্রতিষ্ঠার ঘোষণাও দেওয়া হয়। ১৮৬২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে বঙ্গীয় আইনসভার কার্যক্রম শুরু হয়। সদস্য সংখ্যা প্রথমে ১২ থেকে ১৮৯২ সালে ২১ জন করা হয়। শুরুতে এই সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার বিধান ছিল না। পরে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এটি গড়ে উঠে এবং এ ধারাই বাংলাসহ সারা ভারতে প্রচলিত হয়। তবে আইনসভার উপর ব্রিটিশ শাসকদের কর্তৃত্ব ঠিকই বহাল ছিল।

এদিকে ব্রিটিশরা ১৮৫৩ সালেই বাংলা প্রদেশকে দ্বিখণ্ডিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ১৯০৩ সালে এই লক্ষ্যে সীমানা নির্ধারণ করা হয়। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ সেই পরিকল্পনারই বহিঃপ্রকাশ। পূর্ববঙ্গের আলাদা পরিচয় সেখান থেকেই শুরু হয়।

ব্রিটিশ শাসনকালে (১৮৫৮–১৯৪৭) বাংলার সমাজে বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল কৃষক, অন্য দিকে মুষ্টিমেয় জমিদার ছিল সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণি। সমাজে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের সঙ্গে জড়িত মানুষের সংখ্যা যথেষ্ট ছিল না। বস্তুত ব্রিটিশ শাসনে বাংলার অর্থনীতির মেরুদণ্ড কৃষি ও এককালের সমৃদ্ধ তাঁতশিল্প ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছায়। বাংলার বণিক গোষ্ঠী তেমন সংগঠিত ছিল না, শিল্পেও বাংলার অবস্থান তখন উল্লেখ করার মতো নয়। সামাজিক অনুশাসনের দাপটে নারীসমাজ ব্যাপকভাবে পিছিয়ে ছিল। মধ্যবিত্ত সমাজও ততটা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে নি। ব্রিটেন এই সময়ে পৃথিবীর প্রধান ধনী দেশ। গোটা ভারত ছিল ব্রিটেনের উপনিবেশ—অর্থাৎ শোষণের ক্ষেত্র।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ– ১	:	বাংলায় আগত বিভিন্ন ইউরোপীয় কোম্পানির পরিচয় দাও।
কাজ– ২	:	ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির গৃহীত ব্যবস্থাগুলো উল্লেখ কর।
কাজ– ৩	:	দুই দলে বিভক্ত হয়ে ইংরেজের বিজয় ও বাংলার পরাজয়ের কারণগুলো চিহ্নিত কর।

পাঠ – ৬ : বাংলায় নবজাগরণ

ইংরেজ তাদের শাসন পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে দেশীয়দের মধ্য থেকে ইংরেজি শিক্ষিত একটি অনুগত শ্রেণি তৈরির মনোযোগ দেয়। ১৭৮১ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এর একটা বাড়তি লক্ষ্য ছিল চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করে রাজ্য হারানো ক্ষুব্ধ মুসলমানদের সন্তুষ্ট করা। এরই ধারাবাহিকতায় হিন্দুদের জন্যে ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করা হয় সংস্কৃত কলেজ। ইংরেজদের উদ্দেশ্য সাধনের পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার সংস্পর্শে এসে স্থানীয় মানুষের মধ্যে নতুন চেতনার স্ফূরণ ঘটতে থাকে। বহুকালের প্রচলিত বিশ্বাস, নানা সংস্কার, বিধান সম্পর্কে তাদের মনে সংশয় ও প্রশ্ন জাগতে লাগল। হিন্দু সমাজ থেকেই সতীদাহের মতো প্রথার বিরুদ্ধে রীতিমতো আন্দোলন শুরু হলো, বিধবা বিবাহের পক্ষে মত তৈরি হলো। এদেশে এ সময় জ্ঞানচর্চায় সীমিত কিন্তু কার্যকর জোয়ার সৃষ্টি হয়। ইংরেজরা সারাদেশে স্কুল প্রতিষ্ঠা করল, কিছু কলেজও স্থাপিত হলো উচ্চ শিক্ষার জন্য। অবশেষে ১৮৫৭ সালে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার প্রতিষ্ঠান হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮২১ সনে শ্রীরামপুরে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনও বাংলার মানুষের মনকে মুক্ত করা ও জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে আরেকটি পথ খুলে দেয়। এতে বইপুস্তক ছেপে জ্ঞানচর্চাকে শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া ও স্থায়িত্ব দেওয়ার পথ সুগম হয়। এ সময় সংবেদনশীল মানুষের নজর যায় সমাজের দিকে। সমাজের অনাচার নিয়ে যেমন তাঁরা আত্মসমালোচনা করেছেন তেমনি শাসকদের অবিচারের বিরুদ্ধেও কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন। বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ করে জনমত সৃষ্টিতে এগিয়ে আসেন অনেকে।

রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কারে হাত দেন। ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর প্রমুখ অবাধে মুক্তমনে জ্ঞানচর্চার ধারা তৈরি করেন। আবার বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। বাংলা সাহিত্যে মীর মশাররফ হোসেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলামের অবদানও ব্যাপক।

বাঙালির এই নবজাগরণ কলকাতা মহানগরীতে ঘটলেও এর পরোক্ষ প্রভাব সারা বাংলাতেই পড়েছে।

ঔপনিবেশিক শাসনামলের আধুনিক শিক্ষা ও জাগরণের আরেকটি দিক হলো দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ। সেই সাথে এর ফলে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও গণতান্ত্রিক অধিকার বোধেরও উন্মেষ ঘটতে থাকে। ১৯০৫ সনে ইংরেজ শাসকদের দ্বারা বাংলাকে বিভক্ত করার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে স্বদেশি চেতনার সৃষ্টি হয়। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের ফলে ইংরেজরা বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয়। তাতে বাঙালির স্বদেশচেতনার আবেগ জোরদার হয়,

স্বদেশি আন্দোলনে তার আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং সামগ্রিকভাবে বাংলায় দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক চেতনার জোয়ার আসে। এ সময় অনেক তরুণ সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামের দিকেও ঝুঁকে পড়ে। মুসলমান সমাজের দাবি-দাওয়া তুলে ধরার জন্য ১৯০৬ সালে ঢাকায় স্বতন্ত্র মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে স্বদেশি আন্দোলনের সূত্র ধরেই বাংলায় স্বরাজ আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, সশস্ত্র যুববিদ্রোহ ইত্যাদি ঘটে। এসব নিরবচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে এবং ১৯৪৭ সনে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানে বাংলার নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক আন্দোলনসমূহ উল্লেখ কর।

পাঠ–৭ : ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি

ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল সমগ্র ভারতবর্ষে। বাংলায় সেই আন্দোলন বেশ অগ্রসর ও জোরদার ছিল। কিন্তু সর্বভারতীয় রাজনীতির নেতৃত্ব শেষদিকে বাঙালিদের হাতে থাকে নি। ফলে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন করেও বাংলার জনগণ নিজেদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারে নি। এখানে ব্রিটিশদের 'ভাগ কর, শাসন কর' নীতি সূক্ষ্মভাবে প্রয়োগ করেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব ও কারসাজি। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের রেষারেষিতে বাংলার সাধারণ জনগণ দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে। অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারা থেকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ দূরে সরে যায়। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্তির ফর্মুলা প্রদান করে। তাতে বাংলার জনগণ হিন্দু-মুসলমান পরিচয়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির ক্ষেত্রে লাহোর প্রস্তাবের ধারণাই কার্যকর করা হয়। শেষদিকে বাংলা ভূখণ্ডকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্যে একটা চেষ্টা হলেও ইতোমধ্যে ১৯৪৬ সালের নির্বাচন এবং কলকাতা ও নোয়াখালির দাঙ্গা সব কিছুকে অসম্ভব করে দেয়। পূর্ব-বাংলা পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল হিসাবে ব্রিটিশ অধীনতা থেকে মুক্তি পায়। তবে তা পূর্ব-বাংলার জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠতে পারে নি। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব-বাংলার জনগণের উপর পরাধীনতা চাপিয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের পর থেকেই পূর্ব-বাংলার জনগণকে প্রকৃত স্বাধীনতার জন্যে নতুন করে আন্দোলন শুরু করতে হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ– ১ : বাংলায় নবজাগরণ কীভাবে ঘটেছিল?

কাজ– ২ : শ্রেণিতে আলোচনা করে নবজাগরণের পুরোধা ব্যক্তি রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সচিত্র জীবনী রচনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. **বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন কে?**

ক. নবাব সিরাজউদ্দৌলা
খ. নবাব আলীবর্দী খাঁ
গ. ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ
ঘ. ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি

২. **বাংলা থেকে পুঁজি পাচার শুরু হওয়ার কারণ —**

i . সম্রাটদের বিলাস-বিনোদন বৃদ্ধি

ii. এদেশের শাসকদের সাথে দিল্লির সম্রাটদের সম্পর্কের অবনতি

iii. শাসনকার্য পরিচালনার খরচ বৃদ্ধি পাওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii গ. ii ও iii

খ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

রিমার দাদা তার ছোট বেলার গল্প বলছিলেন। তখন জমিদারদের ধনসম্পদের কোনো অভাব ছিল না। রাজ্যে প্রচুর ফসল হতো। পুকুর ভরা মাছ ছিল, জিনিসপত্রের দামও খুব কম ছিল। কিন্তু খেটে খাওয়া মানুষ অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটাত। কম দামের জিনিসপত্র কেনার সামর্থ্যও তাদের ছিল না।

৩. **রিমার দাদার বর্ণিত ঘটনায় কার শাসনামলের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে?**

ক. মীর জুমলা গ. শায়েস্তা খান

খ. মীর কাসিম ঘ. আলীবর্দী খান

৪. **উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতির ফলে জনগণের —**

i . অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটে

ii. বিদ্রোহী মনোভাব জেগে উঠে

iii. ব্যবসায়ীরা সম্পদ লুণ্ঠন করে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii গ. ii ও iii

খ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নবীনপুর শিক্ষা-দীক্ষায় কিছুটা পিছিয়ে ছিল। ফলে এলাকাবাসী সব ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ ছিল। উক্ত এলাকায় স্থানীয় প্রভাবশালী ও সম্পদশালী এক ব্যক্তির উদ্যোগে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ধীরে ধীরে এলাকার মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো প্রজ্জ্বলিত হয়। কয়েক বছরের ব্যবধানে উক্ত এলাকার মানুষ সমাজ সচেতন হয়ে উঠে। এলাকার শিক্ষিত যুবক রায়হান নারীশিক্ষা, মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে এলাকাবাসীকে সচেতন করে তোলে।

ক. ভারতে প্রথম ভাইসরয় নিযুক্ত হন কে?

খ. বাংলা ১১৭৬ সনে এ দেশে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় কেন?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতির মতো ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় কীসের উদ্ভব ঘটিয়েছিল ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘রায়হানের মতো উন্নয়নকর্মী ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগের ফলই ভারতের স্বাধীনতার পথ সুগম করে’ — উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

অধ্যায়—দুই
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

পাঠ – ১ : মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি

১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং নির্বাচনোত্তর ঘটনাবলি বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ী হয়েছিল। আওয়ামী লীগ নির্বাচনের পর থেকেই গণরায়ের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যে বার বার দাবি জানায়। ১৯৭১ সালের ৩রা জানুয়ারি আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যরা রেসকোর্স ময়দানে প্রকাশ্যে শপথ গ্রহণ করেন।

৩রা জানুয়ারি ১৯৭১ সোহরাওয়ার্দী উদ্যোনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের শপথ গ্রহণ

পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র ও বাঙালির প্রস্তুতি

একদিকে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণের প্রস্তুতি নেয় আর অন্যদিকে জুলফিকার আলী ভুট্টো তা বানচালের জন্য ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। তিনি ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বর্জনের ঘোষণা দিয়ে পাকিস্তানের রাজনীতিতে নতুন সংকট তৈরি করেন। পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া হয় তীব্র। ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবিতে আওয়ামী লীগের সকল কর্মসূচিতে জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত অংশ নেয়। বিশেষ করে ছাত্রদের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। এছাড়া শিক্ষক, পেশাজীবী ও মহিলা সংগঠনগুলো এগিয়ে আসে। একাত্তরের মার্চের শুরু থেকে প্রত্যেকদিন সমাবেশ-মিছিল হয়েছে এবং তাতে প্রচুর লোক সমাগম ঘটে। ভুট্টোর চাপে সাড়া দিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করায় আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। ফলে ওই দিন আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি পার্টির বৈঠকে সর্বাত্মক আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। জনগণ এবারও এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেয়। শুরু হয় বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের আরেক অধ্যায়—অসহযোগ আন্দোলন।

অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপ্তি

আওয়ামী লীগ ২রা মার্চ ঢাকা শহরে ও ৩রা মার্চ সারা দেশে হরতালের ডাক দেয়। ২রা মার্চ সকাল ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নেতৃবৃন্দ

১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭১, জয়বাংলা বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গার্ড অব অনার দেয় এক নতুন পতাকা তুলে যাতে সবুজের ভেতর লাল সূর্য, মাঝখানে হলুদ রঙের বাংলাদেশের মানচিত্র। ২রা মার্চ ১৯৭১, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিশাল সমাবেশে ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ এই পতাকা সর্বসাধারণের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে 'স্বাধীন বাংলার' পতাকা রূপে তুলে ধরেন।

দেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। মুক্তিযুদ্ধে এ পতাকা ছিল আমাদের প্রেরণা। ৩রা মার্চ থেকে শুরু হয় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন যা ২৫শে মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ৩রা মার্চ গঠিত হয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। এতে আন্দোলন আরও বেগবান হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়।

এ পরিস্থিতিতে ভীত হয়ে ইয়াহিয়া খান ৬ই মার্চ এক বেতার ভাষণে ২৫শে মার্চ ঢাকায় পুনরায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সে ঘোষণায় সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণার জন্য আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জনসভার আয়োজন করা হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্যে বাঙালির প্রস্তুতির চিত্র তুলে ধর।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ

পাঠ – ২ : ৭ই মার্চের ভাষণের বৈশিষ্ট্য

বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণে নির্বাচিত দল হিসাবে আওয়ামী লীগের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশ পরিচালনার ঘোষণা দেন। জনগণের প্রতি পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সর্বাত্মক অসহযোগিতার নির্দেশ দিয়ে তিনি তাঁর ভাষণে কোর্ট–কাচারি, অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। আমরা জানি একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র পরিচালিত হয় জনগণের ট্যাক্স বা খাজনায়। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন,''যে পর্যন্ত আমার এ দেশের মুক্তি না হচ্ছে ততদিন খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো।"

বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ থেকে ইয়াহিয়া ও তার সহযোগী ভুট্টোর কর্মকান্ড দেখে বুঝেছিলেন এরা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। তাই তিনি একদিকে আলোচনা ও অন্যদিকে চূড়ান্ত সংগ্রাম ও ত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্য জাতিকে প্রস্তুত হতে বক্তৃতায় আহ্বান জানান । প্রয়োজনে যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তিনি বলেন, "প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক।" বক্তৃতার আর এক জায়গায় তিনি বলেন, "প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে

তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।" এ কথায় গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মুক্ত করার প্রকাশ্য নির্দেশ পাওয়া যায়। তিনি এ বক্তৃতায় ১০ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে 'বাংলাদেশ' শব্দ ব্যবহার করে ভবিষ্যৎ নতুন রাষ্ট্রের নামকরণ চূড়ান্ত করেন ।

বঙ্গাবন্ধুর ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বাঙালিকে তিনি যুদ্ধ, মুক্তি, স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেন। বক্তৃতার শেষ লাইনে,''এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" ঘোষণা দিয়ে তিনি স্পষ্টভাবেই স্বাধীনতার ডাক দেন।

বক্তৃতায় বঙ্গাবন্ধু নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ উন্মুক্ত করতে ইয়াহিয়া ঘোষিত ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করার ব্যাপারে ৪টি পূর্বশর্ত ঘোষণা করেন।

১. সামরিক শাসন প্রত্যাহার।

২. গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর ।

৩. সেনাবাহিনীর গণহত্যার তদন্ত ।

৪. সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া।

এ দাবিগুলো মেনে না নেয়া পর্যন্ত তিনি অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন। ইয়াহিয়ার নেতৃত্বে পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা বঙ্গাবন্ধুর গণতান্ত্রিক এ দাবিগুলো কখনো মেনে নেয় নি। ফলে বাঙালির আন্দোলন বেগবান হয়ে উঠে ।

৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব ও প্রতিক্রিয়া

বঙ্গাবন্ধুর ৭ই মার্চের ঘোষণা ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। এ ভাষণ সারাদেশের মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। তাদের ঐক্যবদ্ধ করে এবং সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। এ ভাষণ যেন জাদুর স্পর্শে বাঙালি জাতিকে বীরের জাতিতে রূপান্তরিত করেছে। তাই অনেকেই মনে করেন, এ ভাষণ বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত । এ ভাষণের পর নেতার নির্দেশনা অনুযায়ী ঐক্যবদ্ধ জনগণ অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেয় এবং মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বঙ্গাবন্ধুর ঘোষণা অনুযায়ী, দেশের স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, কল-কারখানা সব বন্ধ হয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ জনতা পাকিস্তানি বাহিনীকে বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ করতে থাকে। খাজনা-ট্যাক্স আদায় বন্ধ হয়ে যায়। সেনানিবাস ব্যতীত সর্বত্র বঙ্গাবন্ধুর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। গভর্নর হাউস, সেনানিবাস কিংবা সচিবালয় থেকে নয়, সেদিন বাংলাদেশ পরিচালিত হয় বঙ্গাবন্ধুর ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়ি থেকে। এটাই হয় সরকারের কার্যালয়। আর আওয়ামী লীগের সদর দপ্তরে দলের সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে বঙ্গাবন্ধুর নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়নের কাজ চলছিল। অবস্থা উপলব্ধি করে ইয়াহিয়া ১৫ই মার্চ ঢাকা সফরে আসেন এবং বঙ্গাবন্ধুর সাথে আলোচনার প্রস্তাব দেন। ১৬ই মার্চ থেকে আলোচনা শুরু হয়। ২২শে মার্চ জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকা আসেন এবং আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনা ব্যর্থ করে দিয়ে ২৫শে মার্চ রাতে ইয়াহিয়া–ভুট্টো ঢাকা ত্যাগ করেন। আর ওই দিনই মধ্যরাতে বাঙালির উপর নেমে আসে চরম আঘাত। ওই কালরাতে পাকিস্তানি সেনারা বহু বাঙালিকে নির্বিচারে হত্যা করে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ– ১	:	মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র ও বাঙালিদের প্রস্তুতি বর্ণনা কর।
কাজ– ২	:	শ্রেণিকক্ষে আলোচনা ও পাঠের মাধ্যমে একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে তোমার ধারণা সংক্ষেপে লেখ।
কাজ– ৩	:	শ্রেণিতে সবাই মিলে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ শুনে, শিক্ষকদের মতামত জেনে তারপর এ সম্পর্কে তোমার মূল্যায়ন লিখবে।

পাঠ–৩ : গণহত্যার প্রস্তুতি

পাকিস্তানি সেনারা ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে গণহত্যার অভিযান চালিয়েছিল তার নাম দিয়েছিল 'অপারেশন সার্চলাইট'। ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে এ অপারেশন সংঘটিত হলেও মূলত এর প্রস্তুতি চলতে থাকে মার্চের প্রথম থেকে। ৩রা মার্চ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত অস্ত্র ও রসদ বোঝাই এম.ভি. সোয়াত জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৫ই মার্চ থেকে ২৪শে মার্চ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনার ভান করে আসলে অভিযানের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করেন ও অপারেশন সার্চলাইট চূড়ান্ত করেন।

অপারেশন সার্চলাইট

অপারেশন সার্চলাইট অনুযায়ী ঢাকা শহরে গণহত্যার মূল দায়িত্ব দেওয়া হয় মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমেই ঢাকা শহরের পিলখানার ইপিআর হেডকোয়ার্টার এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইনের নিয়ন্ত্রণভার পাকিস্তানি সেনাদের গ্রহণ করার কথা ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণ, বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, রেডিও-টেলিভিশন নিয়ন্ত্রণ, স্টেট ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ, আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেফতার, ঢাকা শহরের যাতায়াত ব্যবস্থাসহ শহর নিয়ন্ত্রণ ছিল হানাদার সৈন্যদের প্রাথমিক দায়িত্ব। অপারেশন সার্চলাইটের আওতায় রাজশাহী, যশোর, খুলনা, রংপুর, সৈয়দপুর, কুমিল্লায় সেনাবাহিনী, ইপিআর, আনসার, পুলিশের বাঙালি সদস্যদের নিরস্ত্র করার কথা উল্লেখ ছিল। চট্টগ্রাম বন্দর ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা দখলে রাখাও তাদের লক্ষ্য ছিল। ঢাকার বাইরে এ অপারেশনের নেতৃত্ব দেন মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা। সার্বিকভাবে এ পরিকল্পনার তত্ত্বাবধান করেন গভর্নর লে. জেনারেল টিক্কা খান।

অপারেশন সার্চলাইটের আওতায় গণহত্যা

পাকিস্তানি সৈন্যরা ২৫শে মার্চ রাত ১১.৩০ টায় ঢাকা সেনানিবাস থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। এ সময় তাদের প্রথম আক্রমণের শিকার হয় ঢাকার ফার্মগেইট এলাকায় রাস্তায় মিছিলরত মুক্তিকামী বাঙালিরা। একই সাথে আক্রমণ চালানো হয় পিলখানা ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনে। বাঙালি সৈন্যরা পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিহত করার চেষ্টা করে। কিন্তু মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যদের পরিকল্পিত আক্রমণ ঠেকানোর মতো অস্ত্র ও প্রস্তুতি ছিল না তাদের। ফলে পাকিস্তানি সেনারা সে রাতে তাদের অনেককেই নির্মমভাবে হত্যা করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে আক্রমণ পরিচালিত হয় গভীর রাতে। ইকবাল হল (জহুরুল হক হল) ও জগন্নাথ হলেও ঢুকে পাকিস্তানি সেনারা গুলি করে অনেক ঘুমন্ত ছাত্রকে হত্যা করে। ঢাকা হলসহ (শহীদুল্লাহ হল) বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা এবং রোকেয়া হলেও তারা ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়। মার্চের এই গণহত্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ জন শিক্ষকসহ ৩০০ ছাত্র ও কর্মচারী নিহত হন। জহুরুল হক হল সংলগ্ন রেলওয়ে বস্তিতে সেনাবাহিনী আগুন দিলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়। শুধু ২৫শে মার্চ রাতেই ঢাকায় ৭ থেকে ৮ হাজার লোক নিহত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণহত্যা

ঢাকার বাইরে সারা দেশে সেনানিবাস, ইপিআর ঘাঁটিতে আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তানি সেনারা বেশ কিছু বাঙালি সেনাকে হত্যা করে। এভাবে আক্রমণের শুরুতেই পাকিস্তানি বাহিনী পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের পুলিশ ও ইপিআর ঘাঁটিগুলোর উপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এসব এলাকায় বহু নিরীহ লোক নিহত হয়।

অপারেশন সার্চলাইট অনুযায়ী, ২৫শে মার্চ রাত দেড়টায় (২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে) বঙ্গবন্ধুকে তাঁর ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাসা থেকে পাকিস্তানি বাহিনী গ্রেফতার করে। তবে গ্রেফতারের আগেই তিনি স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে দেশবাসীকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : অপারেশন সার্চ লাইটের আওতায় সংঘটিত গণহত্যার বর্ণনা দলে অভিনয় করে দেখাও।

পাঠ – ৪ : বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা

২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বঙ্গবন্ধু তাঁর সেই স্বাধীনতার ঘোষণায় কী বলেছিলেন? তিনি বলেন, ''এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে আছেন, আপনাদের যা কিছু আছে তা দিয়ে দখলদার বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না হওয়া পর্যন্ত দেশবাসীকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।"

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

এ ঘোষণা ওয়ারলেসযোগে প্রেরণ করা হয়। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ তা প্রচারে এগিয়ে আসেন। এদিকে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের কয়েকজন উৎসাহী দেশপ্রেমিক কর্মী বেতারের কালুরঘাট সম্প্রচার কেন্দ্রকে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রে' রূপান্তরিত করেন। ২৬শে মার্চ দুপুরে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল হান্নান এই বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি প্রচার করেন। একই কেন্দ্র থেকে ২৭শে মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।

বেতারে প্রচারিত স্বাধীনতার এই ঘোষণা সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকে মুক্তিযুদ্ধ একটি বাস্তব রূপ লাভ করে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক প্রস্তুতি বিক্ষিপ্তভাবে শুরু হলেও ক্রমান্বয়ে এটি একটি গণযুদ্ধে রূপ নেয়। এদেশের সর্বস্তরের মানুষ, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবকদের সঙ্গে সেনাবাহিনী, ইপিআর, পুলিশ ও আনসার এতে অংশ নেয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ– ১ : অপারেশন সার্চলাইটের ভয়াবহ রূপ বর্ণনা কর।

কাজ– ২ : বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা এবং স্বাধীনতা সম্পর্কিত অন্যান্য ঘোষণা সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

পাঠ – ৫ : মুজিবনগর সরকার

মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। একে কখনো অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার, আবার কখনো প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারও বলা হয়। তবে এটি মুজিবনগর সরকার নামে বেশি পরিচিত। এ সরকারের নেতৃত্বেই মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত এবং বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়।

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল গঠিত হয় মুজিবনগর বা বাংলাদেশ সরকার। ওই দিনই মন্ত্রীসভা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ২৬শে মার্চ ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণা অনুমোদন করে। তবে মুজিবনগর সরকার শপথগ্রহণ করে ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল। শপথ বাক্য পাঠ করান অধ্যাপক ইউসুফ আলী।

আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি (পদাধিকার বলে সশস্ত্র বাহিনী ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক)। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি (বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, সশস্ত্র বাহিনী ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক) এবং তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। অন্য তিন জন মন্ত্রী ছিলেন অর্থমন্ত্রী এম. মনসুর আলী, স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামান, পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ।

মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রম

মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রমকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় – ক. বেসামরিক প্রশাসন, খ. সামরিক কার্যক্রম।

প্রত্যেক দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও এর অধীনে দপ্তর থাকে। মুজিবনগর সরকারেরও তা ছিল। এগুলো হচ্ছে– প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য, সাধারণ প্রশাসন, সংস্থাপন, আঞ্চলিক প্রশাসন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, তথ্য ও বেতার, স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, সংসদ বিষয়ক, কৃষি, প্রকৌশল মন্ত্রণালয় এবং বিভাগ।

বাংলাদেশকে ১১টি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করে সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্য বা আওয়ামী লীগ নেতাদের অঞ্চলগুলোর দায়িত্ব দেওয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধকালীন জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে নয় সদস্যবিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। আওয়ামী লীগ নেতা ছাড়াও এর সদস্য ছিলেন প্রবীণ জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, কমিউনিস্ট পার্টি প্রধান মণি সিংহ, ন্যাপ (মোজাফফর) নেতা মোজাফফর আহমদ ও কংগ্রেস নেতা মনোরঞ্জন ধর। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মোজাফফর আহমদ চৌধুরীকে চেয়ারম্যান করে গঠিত হয় মুজিবনগর সরকারের পরিকল্পনা কমিশন।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১	:	মুজিবনগর সরকারের পরিচয় দাও।
কাজ–২	:	সে সময়ে এ দেশের জনগনের অবস্থার একটি চিত্র তুলে ধর।

পাঠ–৬ : মুক্তিবাহিনী গঠন ও কার্যক্রম

মুজিবনগর সরকার সুষ্ঠু ও পরিকল্পিতভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন কর্নেল এম.এ.জি. ওসমানী। এছাড়া চিফ অব স্টাফ ছিলেন কর্নেল (অব.) আবদুর রব। ডেপুটি চিফ অব স্টাফ ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার।

মুক্তিযুদ্ধের ১১ সেক্টর : মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে ১১ জন সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। প্রত্যেক সেক্টর বেশ কয়েকটি সাব-সেক্টরে বিভক্ত ছিল। সেক্টরগুলোর পরিচয় নিচে তুলে ধরা হলো —

এক নম্বর সেক্টর : চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ফেনী নদী পর্যন্ত এলাকা ।

দুই নম্বর সেক্টর : নোয়াখালী, আখাউড়া, ভৈরব রেললাইন পর্যন্ত কুমিল্লা জেলা, সিলেট জেলার হবিগঞ্জ, ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার কিছু অংশ।

তিন নম্বর সেক্টর : আখাউড়া, ভৈরব রেললাইন থেকে পূর্ব দিকে কুমিল্লা জেলা, সিলেট, ঢাকা জেলার অংশবিশেষ ও কিশোরগঞ্জ।

চার নম্বর সেক্টর : সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল, খোয়াই–শায়েস্তাগঞ্জ রেললাইন ছাড়াও পূর্ব ও উত্তর দিকে ডাউকি সড়ক পর্যন্ত অঞ্চল ।

পাঁচ নম্বর সেক্টর : সিলেট জেলার পশ্চিমাঞ্চল, সিলেট–ডাউকি সড়ক থেকে সুনামগঞ্জ–ময়মনসিংহ সড়ক পর্যন্ত এলাকা ।

ছয় নম্বর সেক্টর : রংপুর ও দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও মহকুমা (বর্তমানে জেলা)।

সাত নম্বর সেক্টর : দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চল, রাজশাহী, পাবনা ও বগুড়া জেলা।

আট নম্বর সেক্টর : কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুরের অধিকাংশ এবং খুলনা জেলার দৌলতপুর–সাতক্ষীরা সড়ক পর্যন্ত এলাকা।

নয় নম্বর সেক্টর : দৌলতপুর–সাতক্ষীরা সড়ক থেকে খুলনা জেলার দক্ষিণাঞ্চল, ফরিদপুর জেলার অংশ বিশেষ এবং বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা।

দশ নম্বর সেক্টর : দশ নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল নৌ-কমান্ডো, সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল ও

এগার নম্বর সেক্টর : কিশোরগঞ্জ ছাড়া ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা।

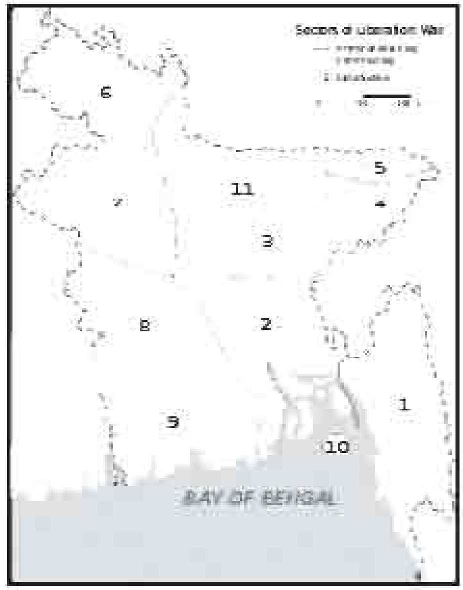

চিত্র : সেক্টরের মানচিত্র

ব্রিগেড ফোর্স

১১টি সেক্টর ও তার অধীন অনেকগুলো সাব-সেক্টর ছাড়াও রণাঙ্গনকে তিনটি ব্রিগেড ফোর্সে বিভক্ত করা হয়। ফোর্সের নামকরণ করা হয় ব্রিগেডগুলোর অধিনায়কদের নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে। মেজর জিয়াউর রহমান ছিলেন 'জেড ফোর্স', মেজর কে. এম. শফিউল্লাহ ছিলেন 'এস ফোর্স' এবং মেজর খালেদ মোশাররফ 'কে ফোর্স'–এর অধিনায়ক।

নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনী

মুক্তিবাহিনী সরকারি পর্যায়ে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল — ১. নিয়মিত বাহিনী ও ২. অনিয়মিত বাহিনী।

কমলাপুর রেলস্টেশনে ঢাকার গেরিলাদের অপারেশন

১. **নিয়মিত বাহিনী :** ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিটগুলোর বাঙালি সৈনিকদের নিয়ে এই বাহিনী গঠিত হয়। সরকারিভাবে এদের নামকরণ করা হয় এম. এফ. (মুক্তিফৌজ)। মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ সরকার নিয়মিত বাহিনী হিসেবে সেনাবাহিনী, বিমান ও নৌবাহিনীও গড়ে তোলে।

২. **অনিয়মিত বাহিনী :** ছাত্র, যুবক, শ্রমিক, কৃষক ও সকল পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বিভিন্ন সেক্টরের অধীনে অনিয়মিত বাহিনী গঠিত হয়। এই বাহিনীর সরকারি নামকরণ ছিল 'গণবাহিনী' বা এফ .এফ. (ফ্রিডম ফাইটার বা মুক্তিযোদ্ধা)। তাদের নিজ নিজ এলাকায় গেরিলা

পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করা হতো। এছাড়া ছাত্রলীগের বাছাইকৃত কর্মীদের নিয়ে গঠিত হয় 'মুজিববাহিনী।' কমিউনিস্ট পার্টি ন্যাপ (মোজাফফর), ন্যাপ (ভাসানী) ও ছাত্র ইউনিয়নের আলাদা গেরিলা দল ছিল।

৩. **আঞ্চলিক বাহিনী** : সেক্টর এলাকার বাইরে আঞ্চলিক পর্যায়ে যেসব বাহিনী গড়ে উঠে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কাদেরিয়া বাহিনী (টাঙ্গাইল), আফসার ব্যাটালিয়ন (ভালুকা, ময়মনসিংহ), বাতেন বাহিনী (টাঙ্গাইল), হেমায়েত বাহিনী (গোপালগঞ্জ, বরিশাল), হালিম বাহিনী (মানিকগঞ্জ), আকবর বাহিনী (মাগুরা), লতিফ মীর্জা বাহিনী (সিরাজগঞ্জ, পাবনা) ও জিয়া বাহিনী (সুন্দরবন)। এছাড়া ছিল ঢাকার গেরিলা দল, যা 'ক্র্যাক প্লাটুন' নামে পরিচিত। ঢাকা শহরের বড় বড় স্থাপনা, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, হোটেল শেরাটন (বর্তমানে রূপসী বাংলা), ব্যাংক ও টেলিভিশন ভবনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় ঢাকার গেরিলারা। এভাবে তারা পাকিস্তানি সেনা ও সরকারের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করে।

শুধু স্থলপথে নয় নৌপথে 'অপারেশন জ্যাকপট' নামে পরিচালিত অভিযানে শুধু একদিনে চট্টগ্রাম বন্দরে ১০টি এবং মংলা বন্দরে ৫০টি জাহাজ ধ্বংস করে মুক্তিযোদ্ধা নৌকমান্ডোগণ সারা পৃথিবীতে সাড়া ফেলে দেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ– ১ : বাংলাদেশের মানচিত্রে মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরগুলো চিহ্নিত কর।

কাজ– ২ : মুজিবনগর সরকারের গঠন ও কাজের বর্ণনা দাও।

পাঠ – ৭ : মুক্তিযুদ্ধে বিরোধী শক্তির তৎপরতা ও ভূমিকা

তখনকার হিসেবে বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের প্রায় সকলেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল। তবে এদেশেরই মানুষের খুব ক্ষুদ্র একটি অংশ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা ও দেশবাসীর স্বার্থের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে পাকিস্তান বাহিনীর সহযোগী হয়।

পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার নামেও ধর্মের দোহাই দিয়ে এই স্বাধীনতা-বিরোধীরা পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে মিলে হত্যা, লুট, অগ্নিকাণ্ড, নারী নির্যাতনসহ সারা দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিকামী বাঙালি ও প্রগতিশীল বাঙালিদের খুঁজে বের করে তাদের তালিকা তারা পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে তুলে দেয়। তাদের অত্যাচার কখনো কখনো পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারকেও ছাড়িয়ে যেত।

মুক্তিযুদ্ধের সময় গড়ে উঠেছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বেশ কয়েকটি সহযোগী সংগঠন।

শান্তি কমিটি : ৯ই এপ্রিল গঠিত হয় ১৪০ সদস্যবিশিষ্ট 'ঢাকা নাগরিক শান্তি কমিটি'। এ কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিল মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, পিডিপি ও মুসলিম লীগ দলের নেতারা। মধ্য এপ্রিলে গঠিত কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির কার্যক্রম জেলা, থানা এমনকি কোথাও কোথাও ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যন্ত প্রসারিত হয়। মূলত এরাই পাকিস্তানি বাহিনীকে পথ চিনিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়ে যায়।

রাজাকার : মুক্তিযুদ্ধের সময় উগ্র-ধর্মান্ধ রাজনৈতিক দলগুলোর প্রত্যক্ষ সহায়তা ও তত্ত্বাবধানে রাজাকার বাহিনী গড়ে উঠে। জামায়াত নেতা মওলানা এ কে এম ইউসুফ ১৯৭১ সালের মে মাসে খুলনায় সর্বপ্রথম রাজাকার বাহিনী গঠন করেন। ধীরে ধীরে অন্যান্য জায়গায়ও রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়। ইসলামী ছাত্র সংঘ ও অন্যান্য উগ্র-ধর্মভিত্তিক দলের সদস্যরা ছাড়াও দাগি আসামি ও বেকার যুবকরা রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেয়।

আলবদর : আলবদররা ছিল সাক্ষাৎ যমদূত। জামায়াতে ইসলামী ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের ছাত্রদের নিয়ে এ বাহিনী গড়ে উঠে। ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে পাকিস্তানি বাহিনী বুদ্ধিজীবী অপহরণ, নির্যাতন ও হত্যার জন্য যে পরিকল্পনা করে তা বাস্তবায়ন করে আলবদররা।

আল-শামস : আল শামস আলবদরের মতোই আরেকটি সংগঠন। মুসলিম লীগ ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনগুলো সম্মিলিতভাবে আল-শামস বাহিনী গঠন করে।

ডা. মালিক মন্ত্রীসভা

পাকিস্তান সরকার বহির্বিশ্বকে বিভ্রান্ত করতে সামরিক গভর্নর জেনারেল টিক্কা খানকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় বেসামরিক ব্যক্তি ডা. আবদুল মোতালিব মালিককে গভর্নর নিযুক্ত করে। তাঁর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী তথাকথিত বেসামরিক সরকার ১৭ই সেপ্টেম্বর গঠিত হয়। ১০ সদস্যবিশিষ্ট মালিক মন্ত্রীসভা সামরিক জান্তার পক্ষ নিয়ে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং বিভিন্ন বক্তৃতা-বিবৃতি ও নির্দেশের মাধ্যমে স্বাধীনতা-বিরোধী কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে। ১৪ই ডিসেম্বর এ সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী বিভিন্ন দল ও সংগঠনের পরিচয় দাও।

পাঠ–৮ : প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বাঙালিরা গণহত্যার প্রতিবাদে ও মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে একত্রিত হতে থাকে। যুক্তরাজ্যকে কেন্দ্র করে সমগ্র ইউরোপে প্রবাসীদের আন্দোলন চলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, সুইডেন, ফ্রান্স, কানাডা ও ইন্দোনেশিয়ার বাঙালিরাও সোচ্চার হয়ে উঠে। গণহত্যার প্রতিবাদে তারা সভা-সমাবেশ আয়োজন করে, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন ও অর্থ সংগ্রহ করে। কেউ কেউ ভারতে গিয়ে যুদ্ধেও অংশ নেয়। বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন আদায়ের জন্য মুজিবনগর সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বিশেষ দূত নিয়োগ করে। তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিদেশে সমর্থন আদায় ও জনমত গঠনের চেষ্টা করেন। যাঁরা এ সময় জীবন ও চাকরির মায়া ত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দেন তাঁদের মধ্যে সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইরাক, ফিলিপাইন, আর্জেন্টিনা, ভারত ও হংকং দূতাবাসের বাঙালি কর্মকর্তারা উল্লেখযোগ্য। তাঁদের পদত্যাগ ও বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর প্রচেষ্টায় জাতিসংঘে ৪৭টি

দেশের প্রতিনিধি বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। এতে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুদণ্ড স্থগিত রাখতে পাকিস্তান সরকার বাধ্য হয়।

বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ সরকারের মিশন

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকেই মুজিবনগর সরকার দিল্লি ও কলকাতায় বাংলাদেশের দুটি মিশন স্থাপন করে। কলকাতাতেই প্রথম বাংলাদেশ মিশন স্থাপিত হয়। এছাড়াও মুজিবনগর সরকার, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক ও লন্ডনে বাংলাদেশ মিশন স্থাপন করে। এসব মিশন বাংলাদেশের পক্ষে মিছিল, সমাবেশ, অনুষ্ঠান, পার্লামেন্ট সদস্যদের সমর্থন আদায়, বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবদান রাখে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : মুক্তিযুদ্ধ সংঘটনে প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকার গুরুত্ব উল্লেখ কর।

পাঠ–৯ : মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পৃথিবীর বৃহৎ কয়েকটি দেশ যেমন–মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন এবং প্রতিবেশী ভারত বিভিন্নভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে। এসব দেশের মধ্যে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সরাসরি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন ছিল পাকিস্তানের পক্ষে।

শরণার্থী শিবির

মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা

ভারত সরকার ২৫শে মার্চ থেকে সংঘটিত পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার নিন্দা করে। গণহত্যার হাত থেকে বাঁচতে সীমান্ত পেরিয়ে আসা প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে ভারত আশ্রয় দেয় এবং তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়। ভারতের মাটিতে এপ্রিলের শেষ দিকে বাঙালি যুবকদের সশস্ত্র ট্রেনিং দেওয়া শুরু হয় যা নভেম্বর মাস পর্যন্ত চলে। পাশাপাশি কলকাতায় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার পরিচালনা ও 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' নামে এই সরকারের বেতার কেন্দ্র স্থাপনে ভারত সহায়তা করে। এছাড়া ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীসহ বিভিন্ন মন্ত্রী, নেতা ও কর্মকর্তারা বিদেশ সফর করে বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠনে ভূমিকা রাখেন। ৩রা ডিসেম্বর ভারতের বিমান ঘাঁটিতে পাকিস্তান বিমান হামলা চালালে চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হয়। এ সময় পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তেও পাক–ভারত যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

৬ই ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ইতোমধ্যে নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ কমান্ড গঠিত হয়। বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনা বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত হয় যৌথ-কমান্ড।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সেদেশের সর্বস্তরের জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও সব ধরনের সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসে। সরকারের পাশাপাশি ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল, বেসরকারি সংগঠন, লেখক-শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী সম্প্রদায় সকলেই এ সময় আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। বাঙালি শরণার্থীদের ব্যয় নির্বাহের জন্য ভারত সরকার এ সময় 'শরণার্থী কর' নামে নতুন একটি কর আরোপ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে চার হাজার ভারতীয় অফিসার ও জোয়ান প্রাণ দেন।

মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকা রেখেছিল। এপ্রিলের শুরুতেই সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পদগর্নি বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে চিঠি দেন। ৩রা ডিসেম্বর চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধবিরতি বিলম্বিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য ছিল যেন যৌথ বাহিনী সামরিক বিজয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও সুযোগ পায়। এই বাহিনী ঢাকা দখল করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যে কোনো প্রকারে যুদ্ধবিরতির পদক্ষেপকে ঠেকিয়ে রাখাই নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েতের ভেটো দানের উদ্দেশ্য ছিল। তাদের এ উদ্দেশ্য সফল হয়।

মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমেরিকার সরকারি নীতি ছিল পাকিস্তানের পক্ষে। প্রথমদিকে অস্ত্র এবং সমর্থন দিয়ে মার্কিন সরকার পাকিস্তানকে সহায়তা করে। তবে নিজ দেশের বিরোধী দলের চাপে মার্কিন সরকার ভারতে অবস্থানরত বাঙালি শরণার্থীদেরও আর্থিক সহায়তা দিয়েছিল। একাত্তরের ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ শুরুর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র প্রচণ্ড ভারত-বিরোধী ও পাকিস্তান-ঘেঁষা নীতি অনুসরণ করতে থাকে। স্বভাবতই তাদের এ ভূমিকা বাংলাদেশের বিপক্ষে যায়। এ সময় যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে সমর্থনে ভারত মহাসাগরে তাদের সপ্তম নৌবহর পাঠায়। তবে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে শেষ পর্যন্ত তারা সে নৌবহরকে কাজে লাগায়নি। পাকিস্তানের পরাজয়ের মুখে যুদ্ধ বিরতি ঘটিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে ভণ্ডুল করতেও জাতিসংঘে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। তবে মার্কিন আইনসভা কংগ্রেস ও

এডওয়ার্ড কেনেডির শরণার্থী শিবির পরিদর্শন

সিনেটের অনেক সদস্য, বিভিন্ন সংবাদপত্র, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদসহ প্রায় সর্বস্তরের মার্কিন জনগণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকা পালন করে। নিউইয়র্কে মার্কিন শিল্পী জর্জ হ্যারিসন 'বাংলাদেশ কনসার্ট' আয়োজন করে তা থেকে প্রাপ্ত অর্থ মুজিবনগর সরকারের কাছে তুলে দেন। ভারতের খ্যাতিমান শিল্পী রবি শঙ্করও মানুষকে উজ্জীবিত করেন।

জর্জ হ্যারিসনের কনসার্ট

গণমাধ্যমের ভূমিকা

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ অপারেশন সার্চলাইট শুরু হওয়ার সময় থেকে বিদেশি সাংবাদিকরা পাকিস্তানিদের গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করেন। তাঁরাই প্রথম বহির্বিশ্বে বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা ও বর্বরতার খবর ছড়িয়ে দেন। সাইমন ড্রিং এরকমই একজন সাংবাদিক। ৭১-এর মাঝামাঝি সময়ে পাকিস্তানি সরকার কিছু বিদেশি সাংবাদিককে নিয়ন্ত্রিতভাবে অধিকৃত বাংলাদেশের কোনো কোনো এলাকা সফর করিয়ে তাদের পক্ষে প্রতিবেদন লেখানোর ফন্দি আঁটে। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। নিজ চোখে সব দেখে তাঁরা পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতা সম্পর্কে অবহিত হন এবং সত্য কথা লেখেন। পত্রিকায় ও বেতারের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে তা অবহিত করেন। এভাবে এন্থনি ম্যাসকারেনহাস গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেন। বিবিসির সাংবাদিক মার্ক টালি পুরোটা সময় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে খবর প্রচার করে গেছেন। এদিকে অবরুদ্ধ দেশে থেকেও অনেক বাঙালি সাংবাদিক ঝুঁকি নিয়ে বিদেশে খবর পাঠিয়েছেন। এজন্য তাদের শত্রুর হাতে চরম মূল্যও দিতে হয়। একাত্তরের শহিদ নিজামউদ্দিন ও নাজমুল হক এরকমই দুজন সাংবাদিক। এছাড়া আকাশবাণী, বিবিসি, ভোয়া প্রভৃতি বেতারকেন্দ্র আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছিল। আকাশবাণী কলকাতা থেকে প্রতি রাতে

প্রচারিত 'সংবাদ পরিক্রমা' খুবই জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ছিল। এটি পাঠ করে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের ঘরে ঘরে পরিচিত হয়ে ওঠেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের 'বজ্রকণ্ঠ' ও চরমপত্রসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান শ্রোতাদের মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছে।এ সময় এম আর আখতার মুকুল চরমপত্র পাঠ করে বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাগ্রত করে তোলেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষ ও বিপক্ষ শক্তির পরিচয় ও ভূমিকা বর্ণনা কর।

কাজ–২ : মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

কাজ–৩ : গ্রন্থাগার, জাদুঘর ও অন্যান্য সূত্র থেকে খবর ও চিত্র সংগ্রহ করে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক দেওয়াল পত্রিকা প্রস্তুত কর।

পাঠ–১০ : যৌথ বাহিনীর নেতৃত্বে চূড়ান্ত যুদ্ধ

মুজিবনগর সরকারের সেক্টরভিত্তিক যুদ্ধ পরিকল্পনার ফলে একাত্তরের মে মাস থেকেই মুক্তিযোদ্ধারা রণাঙ্গনে সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনীর মোকাবেলা শুরু করে। জুন মাস থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাঙালি গেরিলা যোদ্ধারা দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পাকিস্তানি বাহিনীর উপর ব্যাপক আক্রমণ চালাতে থাকে। এতে পাকিস্তানি বাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে। মূলত মধ্য নভেম্বর থেকে ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনীকে সম্মুখ যুদ্ধে কার্যকর সহায়তা দিতে থাকে। ১৩ই নভেম্বর ট্যাংকসহ দুই ব্যাটালিয়ন ভারতীয় সৈন্য যশোরে ঘাঁটি স্থাপন করে। পাকিস্তানি বাহিনীর উপর আরও সুদৃঢ় আক্রমণের জন্য ২১শে নভেম্বর বাংলাদেশ ও ভারত সরকার একটি যৌথ-কমান্ড গঠন করে। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সমন্বয়ে এটি গঠিত হয়। যুদ্ধকালীন মুক্তিবাহিনীর সহায়তাকারী ভারতীয় বাহিনীকে মিত্রবাহিনী বলা হতো। যৌথ-কমান্ড গঠনের ফলে স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধ দারুণ গতি লাভ করে।

যৌথ বাহিনীর অভিযান

যৌথ বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ও তৎপরতা

৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তানি বিমানবাহিনী বিভিন্ন ভারতীয় বিমান ঘাঁটিতে হামলা চালালে শুরু হয়ে যায় পাক-ভারত সর্বাত্মক যুদ্ধ। যৌথ-কমান্ডের অধীনে বাংলাদেশ সীমান্তে এ সময় আক্রমণ শুরু হয়। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহে চালানো হয় বিমান হামলা। ৬ই ডিসেম্বর ভারত সার্বভৌম দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। পরের দিন যশোর বিমান বন্দরের পতনের পর যৌথবাহিনী যশোর শহরে প্রবেশ করে। ৮ থেকে ৯ই ডিসেম্বর মধ্যে কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নোয়াখালী শহর

মিত্র বাহিনীর দখলে আসে। ৯ই ডিসেম্বর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালকে (বর্তমান রূপসী বাংলা) নিরপেক্ষ এলাকা ঘোষণা করে ঢাকাস্থ কূটনীতিক ও বিদেশি নাগরিকদের সেখানে আশ্রয় দেওয়া হয়। ওইদিন বিশেষ বিমানযোগে ঢাকা থেকে ব্রিটিশ ও অন্যান্য বিদেশি নাগরিকদের অপসারণ করা হয়। ১১ থেকে ১২ই ডিসেম্বরের মধ্যে ময়মনসিংহ, হিলি, কুষ্টিয়া, খুলনা, রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর ও সিরাজগঞ্জ মুক্ত হয়।

যৌথ বাহিনীর শেষ যুদ্ধ

যৌথ বাহিনীর গভর্নর হাউস আক্রমণ

১২ই ডিসেম্বর ঢাকায় বিভিন্ন সামরিক অবস্থানের উপর যৌথ বাহিনীর বিমান হামলা চলে। যৌথবাহিনী চারদিক থেকে ঢাকা অভিমুখে রওনা হয়। এর মধ্যে দেশের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন রণাঙ্গণে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ শুরু হয়ে যায়। পূর্ব-পাকিস্তানের তাঁবেদার সরকারের গভর্নর ডা. মালিক ভয়ে পদত্যাগ করে তাঁর মন্ত্রীদের নিয়ে নিরপেক্ষ এলাকায় অর্থাৎ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয় নেন। ১৪ই ডিসেম্বরের মধ্যে ঢাকা ছাড়া দেশের অন্যত্র অনেক বড় শহর ও সেনানিবাসে পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। ঐ দিনই পাকবাহিনীর যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। ঢাকা শহরের চারদিক তখন যৌথ বাহিনী ঘেরাও করে রেখেছে। যে কোনো সময় ঢাকায় পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ ঘটতে পারে অবস্থা সে রকম পর্যায়ে পৌঁছেছে। আত্মসমর্পণের সুবিধার্থে যৌথ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল স্যাম মানেকশ'র আহ্বানে উভয় পক্ষ ১৬ই ডিসেম্বর বিকেল তিনটা পর্যন্ত যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ– ১ : মুক্তিবাহিনী, মিত্রবাহিনী ও যৌথ বাহিনী সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

কাজ– ২ : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ছবি সংগ্রহ করে যৌথভাবে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন কর।

পাঠ–১১ : গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ

দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের পুরো নয়মাস জুড়ে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। আমরা এর আগে জেনেছি, তারা ২৫শে মার্চ মধ্যরাত থেকে নিরস্ত্র বাঙালিদের উপরে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। সে রাতেই তারা সেনানিবাস, ইপিআর দপ্তর, পুলিশ লাইন ও আনসার ব্যারাকে হামলা চালিয়ে বাঙালি সদস্যদের হত্যা ও বন্দী করতে শুরু করে।

পাকিস্তানি বাহিনী আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের দেখামাত্র হত্যার নীতি গ্রহণ করে। সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় ছিল তাদের নির্বিচার হত্যার প্রধান শিকার। তাদের বাড়িঘর, দোকানপাট, পাড়া ও গ্রাম লুট

করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। দেশের শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী সমাজ ছিল পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসরদের বিশেষ টার্গেট। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে ও শেষ পর্যায়ে এভাবে দেশকে মেধাশূন্য করার পরিকল্পনা থেকে তারা বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপকভাবে হত্যা করে।

দেশের অভ্যন্তরে মানুষ ছিল অবরুদ্ধ, অনেকে পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকার-আলবদরদের ভয়ে পুরো নয়মাস দেশের ভেতরে আত্মগোপন করে জীবন কাটিয়েছে। আর দেশ ছেড়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল প্রায় এক কোটি মানুষ। শরণার্থী শিবিরে বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পুড়ে, অপুষ্টিতে ও রোগে ভুগে বহু শিশু প্রাণ হারায়। বৃদ্ধ ও নারীদের জীবনেও অভিশাপ নেমে আসে। একইভাবে দেশের ভেতরে আবরুদ্ধ মানুষও পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসরদের গণত্যার মৃত্যুর শিকার হয় ।

মুক্তিযুদ্ধে যে ত্রিশ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছেন তাদের মধ্যে নাম না জানা অনেক মানুষ যেমন ছিল তেমনি দেশের অনেক শীর্ষস্থানীয় ও নামী ব্যক্তিত্বও ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর গোবিন্দ্রচন্দ্র দেব, মুনীর চৌধুরী ও জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, চিকিৎসক ডা. ফজলে রাব্বি ও ডা. আলিম চৌধুরী, সাংবাদিক শহীদুল্লা কায়সার, নিজামউদ্দিন ও সিরাজউদ্দিন হোসেন, দানশীল সমাজসেবক রণদা প্রসাদ সাহা ও নূতনচন্দ্র সিংহ, রাজনীতিবিদ ধীরেন দত্ত ও মশিউর রহমান, লেখিকা সেলিনা পারভীন ও মেহেরুন্নেসা, সাহিত্যিক শহীদ সাবের ও আনোয়ার পাশা, সঙ্গীতজ্ঞ আলতাফ মাহমুদসহ এ তালিকা অনেক দীর্ঘ।

এই পরিকল্পিত গণহত্যা চালাতে গিয়ে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসররা এদেশে অনেকগুলো বধ্যভূমি তৈরি করেছে। এর মধ্যে কয়েকটি বড় বধ্যভূমি হলো ঢাকার রায়েরবাজার, চট্টগ্রামর পাহাড়তলী, খুলনার খালিশপুর, সিলেটের শমসেরনগর ইত্যাদি। সারাদেশে বিভিন্ন জেলা ও মহকুমায় নির্জন নদীতীর ও চা বাগানেও অসংখ্য বধ্যভূমি গড়ে তুলেছিল ঘাতকরা।

এই গণহত্যা চলেছে সারাদেশে পুরো নয় মাস জুড়ে। যদিও খুবই নিষ্ঠুর ও রোমহর্ষক তবুও পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের নির্যাতনের ধরন সম্পর্কে আমাদের কিছুটা হলেও জানা দরকার। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নির্যাতন করে পরে তারা আটককৃতদের হত্যা করত। হাত-পা বেঁধে গুলি করে নদী, জলাশয় ও গর্তে ফেলে রাখা ছিল সাধারণ ঘটনা। এছাড়া একটি একটি করে অঙ্গাচ্ছেদ করে, তারপর গুলি করে হত্যা করা হতো। চোখ উপড়ে ফেলা, মাথায় আঘাত করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা, মুখ থেঁতলে দেওয়া, বেয়নেট ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে হৃদপিণ্ড উপড়ে ফেলা, আঙ্গুলে সুঁচ ফুটানো, নখ উপড়ে ফেলা, শরীরের চামড়া কেটে লবণ ও মরিচ দেওয়া ছিল অত্যাচারের অন্যান্য নিষ্ঠুর ধরন। বন্দীশালা ও বধ্যভূমি থেকে বেঁচে আসা অনেকের কাছ থেকে পাওয়া বিবরণ আরও ভয়াবহ যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : দলগতভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিশিষ্ট শহিদদের ছবি সংগ্রহ করে পরিচিতিসহ অ্যালবাম তৈরি কর।

কাজ–২ : স্কুলে মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদান ও তাঁদের অভিজ্ঞতা শোনার জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন কর।

পাঠ – ১২ : পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১। ওইদিন পাকিস্তানি বাহিনী তাদের শোচনীয় পরাজয় মেনে নিয়ে যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। এর মধ্য দিয়ে আমরা লাভ করি আমাদের বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্র।

যদিও ১৬ই ডিসেম্বর বিকেল ৫টায় আত্মসমর্পণ দলিল স্বাক্ষরিত হয় কিন্তু এর আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় ওইদিন দুপুর থেকেই। সেদিন ভোর ৫টা থেকেই যুদ্ধ বিরতি শুরু হয়। মেজর জেনারেল নাগরা যৌথ বাহিনীর অগ্রবর্তী দলের প্রতিনিধি হিসেবে পাকিস্তানি বাহিনীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। ইতোমধ্যে দুপুরে আত্মসমর্পণ দলিলটি নিয়ে ভারতীয় বাহিনীর চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জ্যাকব ঢাকা এসে পৌছান। শীতের পড়ন্ত বিকেলে একটি হেলিকপ্টারে আগরতলা থেকে এসে পৌছান যৌথ বাহিনীর অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি, মুক্তিবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার। হেলিকপ্টারে করে তেজগাঁ বিমান বন্দরে নেমে জিপে করে লে. জেনারেল অরোরা ও এ. কে. খন্দকার সরাসরি রেসকোর্স ময়দানে যান। রাস্তার দু–ধার ছিল লোকে লোকারণ্য। সকলে 'জয় বাংলা' শ্লোগানে ঢাকার আকাশ-বাতাস মুখরিত করে রাখে । ইতোমধ্যে খবর পেয়ে রেসকোর্সেও হাজার হাজার বাঙালি উপস্থিত হয়। যুদ্ধে আত্মসমর্পণের সকল নিয়ম পাকিস্তানি বাহিনী অনুসরণ করে। রেসকোর্স ময়দানে খোলা আকাশের নিচে একটি টেবিলে বসে লে. জেনারেল নিয়াজী ও লে. জেনারেল

১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় উল্লাস

আত্মসমর্পণের দৃশ্য

জগজিৎ সিং অরোরা আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন। এর মাধ্যমে পাকিস্তানি বাহিনী পরাজয় মেনে নেয়। আত্মসমর্পণের নিয়মানুযায়ী লে. জে. নিয়াজী তার কোমরের বেল্ট থেকে রিভলভার ও ইউনিফর্মের ব্যাজ খুলে লে. জেনারেল অরোরাকে দেন। পরাজিত পাকিস্তানি বাহিনীর অন্য সবাই ব্যাজ খুলে তাঁকে অনুসরণ করেন। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানটি ছিল কয়েক মিনিটের। নিরাপত্তার কারণে আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানি সেনাদের যুদ্ধবন্দী হিসাবে দ্রুত সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে ঢাকার বাইরে পাকিস্তানি বাহিনীর চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করতে ২২শে ডিসেম্বর পর্যন্ত লেগে যায়। সামরিক ও বেসামরিক মিলে মোট ৯১ হাজার ৬৩৪ জন পাকিস্তানি সৈন্য যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। নিয়াজীর জনসংযোগ অফিসার মেজর সিদ্দিক সালিকের সেদিনকার প্রতিক্রিয়া ছিল এরকম– "রিভলভারের সাথে সাথে নিয়াজী পূর্ব পাকিস্তানও তুলে দিলেন।" ।

এভাবে আমাদের মুক্তিবাহিনীর বীরত্বপূর্ণ লড়াই, সমগ্র দেশবাসীর দৃঢ় ঐক্য, মিত্র বাহিনীর সক্রিয় সহায়তা এবং বিশ্ব জনমতের সমর্থনে মাত্র নয় মাসে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ তার সফল সমাপ্তিতে পৌঁছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : ১৬ই ডিসেম্বর আত্মসমর্পণের ছবিটি সংগ্রহ করে একটি বিবরণী লেখ।

কাজ–২ : কয়েকটি যুদ্ধ ও বীর যোদ্ধার পরিচয় দাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ১৯৭১ সালের কোন তারিখে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়?

ক. ২৬শে মার্চ গ. ১০ই মার্চ

খ. ২৭শে মার্চ ঘ. ১৭ই এপ্রিল

২. ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল—

i . জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বর্জন করা

ii. ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবিতে আওয়ামী লীগের উদ্যোগ নেয়া

iii. হরতাল কর্মসূচিতে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশ নেয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. ii গ. i ও iii

খ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী সামিয়া ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। তার ছবিতে একজন লোক চশমা পরা, কোট পরা, একটি আঙ্গুল উঁচু করে ভাষণ দিচ্ছেন আর উপস্থিত জনতা উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে।

৩. সামিয়ার অঙ্কিত চিত্রে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে?

ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ. হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী

খ. আবুল কাশেম ফজলুল হক ঘ. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

৪. উদ্দীপকে উক্ত ব্যক্তির ভাষণ প্রধানত কীসের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে?

ক. ভাষা আন্দোলনের

খ. স্বাধীনতা আন্দোলনের

গ. ছয় দফা বাস্তবায়নের

ঘ. অসহযোগ আন্দোলনের

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. মানচিত্রে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা সংক্রান্ত বিশেষ স্থান চিহ্নিত করা হলো।

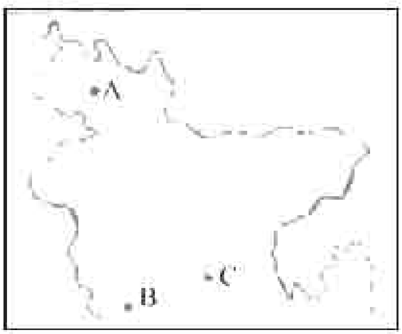

ক. মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন?

খ. অপারেশন সার্চলাইট বলতে কী বোঝায়?

গ. মানচিত্রে 'C' চিহ্নিত স্থানে মুক্তিযুদ্ধের কোন্ সেক্টরটি ছিল? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'B' চিহ্নিত স্থানই ছিল মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার প্রাণকেন্দ্র— মতামত দাও।

২. সুমন তার বন্ধু রায়হানকে নিয়ে জাদুঘর পরিদর্শনে গেল। সেখানে তারা যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ প্রত্যক্ষ করে। তারা আরও প্রত্যক্ষ করে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপরে হত্যাযজ্ঞ, বাড়িঘর, দোকানপাট লুণ্ঠন ও পোড়ানো এবং চোখ বাঁধা অবস্থায় নির্যাতনের ছবি। জাদুঘরে এসব দৃশ্য দেখে তাদের শরীর শিউরে উঠে। কিন্তু দলিল স্বাক্ষরের একটি দৃশ্যের ছবি দেখে তাদের মন আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠে।

ক. কোন্ তারিখে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়?

খ. যৌথ কমান্ড গঠন করা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতি কোন যুদ্ধকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জাদুঘরে রক্ষিত দলিল স্বাক্ষরের দৃশ্যের ছবি দেখে সুমন ও রায়হান কেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

অধ্যায়–৩

বাঙালির সংস্কৃতি ও শিল্পকলা

বাঙালি সমৃদ্ধ সংস্কৃতির অধিকারী একটি প্রাচীন জাতি। আমরা জানি-মানুষ যেভাবে জীবনযাপন করে, যেসব জিনিস ব্যবহার করে, যেসব আচার-অনুষ্ঠান পালন করে, যা কিছু সৃষ্টি করে, সব নিয়েই তার সংস্কৃতি। খাদ্য, বাসস্থান, তৈজসপত্র, যানবাহন, পোশাক, অলঙ্কার, উৎসব, গীতবাদ্য, ভাষা-সাহিত্য সবই তার সংস্কৃতির অংশ। তবুও এর মধ্যে সৃষ্টিশীল কিছু কিছু কাজ সংস্কৃতির বিচারে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এসব কাজে একটি জাতির চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলোকে আমরা বলি শিল্পকলা। আমরা এই অধ্যায়ে আমাদের সেই সব সৃষ্টিশীল সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত হব। দৃশ্যশিল্প, সাহিত্যশিল্প ও সঙ্গীতশিল্প এই তিন শাখায় আমাদের অবদান ও কীর্তি স্মরণ করব।

পাঠ – ১ : দৃশ্যশিল্প : এগুলো বেশিরভাগই বস্তুগত শিল্প বা সংস্কৃতি হিসেবে পরিচিত।

পলিমাটির আমাদের এই দেশ। এই দেশে একদিকে মাটি আর অন্যদিকে এ মাটিতে জন্মানো বাঁশ মানুষের ঘর তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছে। বাঙালির ঐতিহ্যবাহী সুনির্মিত ঘর হলো মাটির তৈরি ও বাঁশের তরজার ছাউনিযুক্ত দোচালা, চারচালা, এমনকি আটচালা ঘর। কখনো কখনো বাঁশের কাঠামোর ওপর শন দিয়ে চাল ছাওয়া হয়েছে। এখনও আমাদের গ্রামগঞ্জে বেশির ভাগ ঘরই এরকম।

এক সময় ছাঁচ অনুযায়ী মাটির তৈরি ইট দিয়ে মন্দির বানানো হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে শিল্পমূল্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মাটির ফলক বা পাত তৈরি করে তাতে ছবি উৎকীর্ণ করে পুড়িয়ে স্থায়ী রূপ দেওয়া। এগুলোকে টেরাকোটা বা পোড়ামাটির শিল্প বলা হয়। দিনাজপুরের কান্তজির মন্দিরে এভাবে পোড়ামাটির কাজ দিয়ে রামায়ণের কাহিনী উৎকীর্ণ আছে। পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারেও পোড়ামাটির প্রচুর কাজ আছে। এতে সেকালের সমাজ জীবনের ছবি পাওয়া যায়। কালো রঙের কষ্টিপাথর আর নানা রকম মাটি দিয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি বানানোর ঐতিহ্যও বেশ পুরনো।

তবে পালযুগে তালপাতার পুঁথিতে দেশীয় রঙ দিয়ে যেসব ছবি আঁকা হয়েছে তার প্রশংসা আধুনিক কালের বিশ্বের শিল্পরসিকদের কাছ থেকেও পাওয়া যাচ্ছে। হাজার বছর পরেও ছবিগুলো চমৎকার ঝকঝকে রয়েছে। পুঁথিগুলো ছিল বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের।

বাংলার তাঁতশিল্পের সুনাম বহুকালের। প্রাচীন বাংলার দুকূল কাপড়ের বেশ খ্যাতি ছিল । কৌটিল্য বলেছেন, পুন্ড্রদেশের (উত্তরবঙ্গ) দুকূল শ্যামবর্ণ এবং মণির মতো মসৃণ। দুকূল ছিল খুব মিহি আর ক্ষৌমবস্ত্র একটু মোটা। পত্রোর্ণ নামে এণ্ডি বা মুগা জাতীয় সিল্ক তৈরি হতো মগধ ও পুন্ড্রে। সেকালে এদেশের দুকূল, পত্রোর্ণ, ক্ষৌম ও কার্পাস কাপড় বিদেশে রপ্তানি হতো।

বাংলায় বিভিন্ন সময় যেসব কাপড় উৎপন্ন হতো তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো খাসা, এলাচি, হামাম, চৌতা, উতানি, সুসিজ, কোসা, মলমল, দুরিয়া, মিরাবান্দ ইত্যাদি। বাংলার বিখ্যাত মসলিন কাপড় এতই সূক্ষ্ম ও উন্নতমানের ছিল যে এ কাপড় নিয়ে বহু কাহিনী বা কিংবদন্তির সৃষ্টি হয়েছিল।

বাংলার শাড়ির খ্যাতিও বহুকালের – সিল্ক, জামদানি, টাঙ্গাইল, মসলিন, গরদ ইত্যাদি এখনও সুপরিচিত।

সুলতানি আমল থেকে বাংলার স্থাপত্যশিল্পে ইরানি তুরানি প্রভাব পড়তে শুরু করে। গম্বুজ ও খিলানসহ মসজিদ তো নির্মিত হয়েছেই, অনেক দপ্তর ও বাড়িঘরও তৈরি হয়েছে এই রীতিতে। ছোট সোনা মসজিদ, নবাব কাটরা, ঢাকার লালবাগের কুঠি এ সময়ের স্থাপত্য নিদর্শন।

বাংলার নকশিকাঁথার কথা না বললেই নয়। গ্রামীণ মহিলারা ঘরে ঘরে কাঁথা সেলাই করে তাতে আশ্চর্য নিপুণতায় গল্পকাহিনী ও ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। এখনও সমাজের দরিদ্র নারীরা এই শিল্পকর্মটি টিকিয়ে রেখেছেন।

এছাড়া কাঠের কাজ বা কারুশিল্প, শঙ্খের কাজ, বাঁশ-বেত ও শোলার কাজেও বাংলার মানুষ যেমন দক্ষতা দেখিয়েছে তেমনি তাদের সৃজনশীল মনের প্রকাশ ঘটিয়েছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : বাঙালির সংস্কৃতি ও শিল্পকলার বিকাশে ভূমিকা রেখেছে এমন কয়েকটি দৃশ্যশিল্পের উল্লেখ কর।

পাঠ– ২ : সাহিত্যশিল্প : বাঙালির প্রথম যে সাহিত্যকর্মের সন্ধান পাওয়া যায় তা চর্যাপদ নামে পরিচিত। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রথম নেপালের রাজ দরবার থেকে এগুলো আবিষ্কার করেন। পরে ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ চর্যাপদের কাল নির্ণয় করেন। তিনি গবেষণা করে জানান প্রায় দেড় হাজার বছর আগে থেকে বৌদ্ধ সাধকরা এগুলো লিখেছেন। এখন হয়ত আমাদের পক্ষে এগুলো বোঝা কঠিন হবে। তাছাড়া শাব্দিক অর্থ ছাড়াও এগুলোর ভাবার্থও বুঝতে হয়। কিন্তু এগুলোই হলো আদি বাংলা সাহিত্যের নমুনা। চর্যাগীতির বিখ্যাত রচয়িতাদের মধ্যে ছিলেন লুই পা ও কাহ্ন পা। আমরা নিচে চর্যার একটি নমুনা ও তার অনুবাদের সঙ্গে পরিচিত হব।

লুই পা লিখেছেন –

কা আ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল
চঞ্চল চী এ পইঠা কাল ॥

বাংলায় এর শাব্দিক অর্থ হলো –

শ্রেষ্ঠ তরু এই শরীর, পাঁচটি তার ডাল। চঞ্চল চিত্তে কাল (ধ্বংসের প্রতীক) প্রবেশ করে।

এর ভাবার্থ হলো– শরীরের পাঁচটি ইন্দ্রিয় পাঁচটি ডাল স্বরূপ। এই পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে বাইরের জগতের সঙ্গে জানাশোনা চলে। এতে বেশি আকৃষ্ট হলে বস্তুজগতকেই মানুষ চরম ও পরম জ্ঞান করে ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

সুলতানি আমলে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ভাবধারার প্রভাবে বাংলায় কীর্তন গান রচনার জোয়ার আসে। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার কাহিনী নিয়ে এসব আবেগপূর্ণ গান রচিত হয়েছে। এগুলো বৈষ্ণব পদাবলী নামে পরিচিতি। বৈষ্ণব পদাবলীর বিখ্যাত পদকর্তাদের মধ্যে আছেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস,

গোবিন্দ দাস প্রমুখ। তখনকার সমাজব্যবস্থায় হিন্দু-মুসলমানে এতই ঘনিষ্ঠ ভাব ছিল যে অনেক মুসলমান কবিও পদাবলী রচনা করেছেন।

দেশীয় দেবদেবীকে নিয়েও নানা কাব্যকাহিনী রচিত হয়েছে এক সময়। এগুলো মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এছাড়া ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে সেকালের বাংলার সমাজচিত্র পাওয়া যায়।

মুসলমান সমাজে পুঁথিসাহিত্যের ব্যাপক কদর ছিল। পারস্য থেকে পাওয়া নানা কল্পকাহিনী এবং রোমান্টিক আখ্যান নিয়ে এগুলো রচিত হতো। সেকালে বাড়ি বাড়ি পুঁথি পাঠের আসর বসত, আবার পুঁথি নকল করে সংরক্ষণও করা হতো। ইউসুফ-জোলেখা, লায়লি-মজনু, সায়ফুল মুলক বদিউজ্জামাল, জঙ্গনামা ইত্যাদি বিখ্যাত সব পুঁথির নাম। আলাওল রচিত পদ্মাবতী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে আলোচিত।

ইংরেজ আমলে আমাদের দেশে বাংলা গদ্যের সূচনা হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিত গড়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র ও সমসাময়িক সাহিত্যিকরা যার উপর সৌধ তুলেছেন আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে শোভন ও সুন্দর করে পূর্ণতা দিয়েছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মীর মশাররফ হোসেন, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিকাশে ভূমিকা রেখেছেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : বাংলার শিল্প সাহিত্যের বিকাশের একটি ধারাবাহিক চিত্র দাও।

পাঠ – ৩ : সংগীত শিল্প

বাংলা চিরকালই সংগীতের দেশ। এখানকার মাঠে-প্রান্তরে কৃষক হাল চাষ করতে করতে যেমন গান বেঁধেছে তেমনি নদী ও খালে নৌকা বাইতে বাইতে মাঝিও গলা ছেড়ে গান গেয়েছে। আবার সাধারণ মানুষ তার মতো করে গানের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সাধনা করেছে। আমরা সাহিত্য-শিল্পের আলোচনায় আমাদের দুই আদি সংগীত চর্যাপদ ও বৈষ্ণব পদাবলীর কথা আগেই জেনেছি। কীর্তনগান প্রধানত হিন্দু সমাজে হতো, এখনও হয়। তবে বাউল ও ভাটিয়ালি গান গ্রামের হিন্দু–মুসলমান সকলেই গেয়ে থাকে। মুর্শিদি, পালাগান, বারমাস্যা, ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা ইত্যাদি বহু ধরনের আঞ্চলিক লোকগান ছড়িয়ে আছে সারা বাংলা জুড়ে।

শহরাঞ্চলে একসময় পাঁচালি, খেউড়, খেমটা প্রভৃতি গানের আসর বসত। তবে উত্তর ভারতের সংস্পর্শে এসে হিন্দুস্থানি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাথে বাঙালি সঙ্গীত সাধকদের পরিচয় ঘটে। তার প্রভাবে এখানে নাগরিক সংগীতের বিকাশ ঘটে। নিধুবাবু, কালী মির্জা প্রমুখ হয়ে রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলার নাগরিক গান উৎকর্ষের শীর্ষে পৌঁছায়। তাঁরই গান আজ আমাদের জাতীয় সংগীত – 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। এ গানের সুর তিনি নিয়েছেন বাউল গানের সুর থেকে। রবীন্দ্রনাথের পথ ধরে পরে আরও অনেকেই বাংলার নাগরিক গানকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম আপন স্বাতন্ত্র্যে ও বৈচিত্র্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। মাত্র

কুড়ি বছরের সৃষ্টিশীল জীবনে তিনি প্রায় ছয় হাজারের মতো গান লিখেছেন। অতুল প্রসাদ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন আধুনিক বাংলা গানের সমৃদ্ধিতে এদের অবদানও কম নয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ– ১ : পোড়ামাটির কাজ কাকে বলে? কয়েকটি কাজের দৃষ্টান্ত দাও।

কাজ– ২ : বাংলার প্রাচীন দৃশ্যশিল্পের তালিকা তৈরি কর। এসবের নিদর্শন ও ছবি দিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শনীর আয়োজন কর।

কাজ– ৩ : বাংলাসাহিত্যের প্রাচীন কয়েকটি নিদর্শনের পরিচয় দাও।

কাজ– ৪ : বাঙালির সংগীত সম্ভারের পরিচয় লেখ।

পাঠ – ৪ : প্রতিষ্ঠান

আধুনিক কালের মানুষ মননচর্চা ও সৃজনশীলতার চর্চার জন্যে নানান প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। বাংলাদেশেও এ ধরনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে ও ১৯৫৪-র যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলা একাডেমী। এটিকে জাতির মননের প্রতীক বলা হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য এ প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে আসছে। এছাড়া চারুকলা ও সংগীত-নাটক-নৃত্য প্রভৃতি ললিত কলা চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা, অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি, গবেষণা ও প্রসারের জন্যে রয়েছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী। সকল জেলা শহরে যার শাখা আছে। শিল্পকলা ও সাহিত্যচর্চায় শিশুদের উৎসাহিত করার ও সুযোগ দেওয়ার জন্য আছে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী। এরও শাখা রয়েছে প্রত্যেক জেলা শহরে।

এছাড়া বিশ্বের যে কোনো উন্নত দেশের মতোই মনন চর্চার জন্য রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়, গণগ্রন্থাগার প্রভৃতি। আর সাংস্কৃতিক নিদর্শন সংরক্ষণ, তা নিয়ে গবেষণা ও তা প্রদর্শনের জন্যে রয়েছে জাতীয় জাদুঘর। দেশে সরকারি ও বেসরকারি আরও কয়েকটি জাদুঘর রয়েছে। এছাড়া চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন বা জাতীয় উদ্যান, নভোথিয়েটার, বিজ্ঞান জাদুঘরসহ নানা প্রতিষ্ঠান দেশে গড়ে উঠেছে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগেও গড়ে উঠেছে এ ধরনের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান। রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এরকম কয়েকটি উদ্যোগ। এছাড়া অনেকগুলো সংগঠন সংস্কৃতি চর্চায় নিরন্তর কাজ করে চলেছে। আমাদের দেশের এরকম দুটি ঐতিহ্যবাহী সংগঠন বুলবুল ললিতকলা একাডেমী (বাফা) ও ছায়ানট। উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী ও ক্রান্তি স্বাধীনতা পূর্বকাল থেকেই গণসঙ্গীতের চর্চা করে আসছে। খেলাঘর ও কচিকাঁচার আসরের মতো সংগঠনগুলো সারাদেশে শিশু-কিশোরদের জন্য কাজ করে। ঢাকা ও সারাদেশে অনেকগুলো নাট্যদল নিয়মিত নাটক মঞ্চায়ন করে থাকে। রয়েছে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ, নাট্য সমন্বয় পরিষদ, আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের মতো বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের রাজধানীভিত্তিক ফেডারেশন।

যেসব ব্যক্তিত্বের অবদানে শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্পে আমাদের কৃতিত্ব বিশ্ব পরিসরে আমাদের পরিচিতি দিয়েছে তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় কয়েকজনের কথা আমাদের জানা দরকার।

বাংলা ভাষার গবেষকদের মধ্যে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও ড. মুহম্মদ এনামুল হকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ড. শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছেন, চর্যাপদের কাল নির্ণয় করেছেন ও আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সংকলন করেছেন। এনামুল হক আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্যচর্চার ইতিহাস লিখেছেন। বাংলার সমৃদ্ধ লোকসাহিত্য ও পুঁথিসাহিত্য সংগ্রহ করে আমাদের গ্রামসমাজের সংস্কৃতিচর্চার ধারাবাহিকতা প্রমাণ করেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও মুহাম্মদ মনসুর উদ্দিন। যুক্তিবাদী মননশীল প্রবন্ধসাহিত্যের জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন আবুল ফজল, মোতাহার হোসেন চৌধুরী, কাজী মোতাহের হোসেন, আব্দুল হক, ড. আহমদ শরীফ প্রমুখ।

উপন্যাস ও কথাসাহিত্যে আমাদের লেখকদের অনেকেই প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এর মধ্যে মাহবুব-উল আলম, শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আবু ইসহাক, শওকত আলী, হাসান আজিজুল হক ও আক্তারুজ্জামান ইলিয়াসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা তো কবিতার দেশ হিসেবে পরিচিত। জসীমউদ্দীন, আহ্সান হাবিব, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, শহীদ কাদরীসহ বহু কবির অবদানে আমাদের কাব্যসাহিত্য উজ্জ্বল। নাটকের ক্ষেত্রেও আমাদের সাফল্য কম নয়। মুনীর চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক, আবদুল্লা আল মামুন, সেলিম আল দীন প্রমুখ আমাদের প্রধান নাট্য ব্যক্তিত্ব।

জাতির নানা দুঃসময়ে নারীদের মধ্যে সাহসী ভূমিকার জন্যে কবি সুফিয়া কামালের নাম স্মরণীয়। তাছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে শামসুননাহার মাহমুদ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে জাহানারা ইমামের কথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

গানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-নজরুলের অবদানে আজও বাঙালি মন রসসিক্ত। তবে লোকগানের যে বিশাল ভাণ্ডার আছে আমাদের তাতে ফকির লালন শাহ থেকে শাহ আবদুল করিম পর্যন্ত অনেকের অবদানই স্বীকার করতে হবে। হাসন রাজা বা রাধারমণের গান আজও শ্রোতাদের ভক্তি ও ভাবরসে উদ্দীপ্ত করে। লোকগানে আব্বাসউদ্দিন আহমদ যদি সম্রাট হয়ে থাকেন তবে আবদুল আলীম ছিলেন যুবরাজ।

চিত্রকলায় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকেই পথিকৃৎ ধরা হয়। তাঁর পরপর কামরুল হাসান, এস এম সুলতান ও সফিউদ্দীন আহমদের কথাও স্মরণ করতে হবে আধুনিক চিত্রকলা চর্চার অগ্রদূত হিসেবে।

ভাস্কর্যে স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল এক প্রতিভা নভেরা আহমেদ। স্থাপত্যকলায় গগনচুম্বি ভবন নির্মাণ পদ্ধতির প্রবর্তক, বিশ্বের বহু বিখ্যাত ভবন ও স্থাপনার নকশাকার এফ. আর খান আমাদের গর্ব।

এদেশে উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চার ক্ষেত্রে উপমহাদেশ-খ্যাত ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর প্রভাব চির-স্মরণীয়। তাঁর ছোট ভাই আয়াত আলী খানও এক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। বুলবুল চৌধুরী বাঙালি মুসলমান সমাজে নৃত্যচর্চার দ্বার উন্মোচন করেছিলেন। স্বল্পায়ু জীবন নৃত্যচর্চায় তার কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়।

অনেকেরই অবদানে আমাদের চলচ্চিত্র শিল্প সমৃদ্ধ হয়েছে। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয় জহির রায়হান, আলমগীর কবীর, সুভাষ দত্ত, খান আতা ও তারেক মাসুদকে। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পুরোধা ব্যক্তিত্ব হিসেবে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয় তিন সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন, আবদুস সালাম ও জহুর হোসেন চৌধুরীর নাম।

সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে অসংখ্য গুণীজন ও প্রতিভাধর ব্যক্তি আজও কাজ করে চলেছেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : আধুনিক কালে মননচর্চা ও সৃজনশীলতা চর্চার জন্য বাংলাদেশে যেসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তার একটি তালিকা কর।

কাজ–২ : বাংলা শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন এমন কয়েকজন ব্যক্তিত্বের কৃতিত্ব উল্লেখ করে তালিকা তৈরি কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. **প্রাচীনকালে বাংলার কোন কাপড়ের বেশ সুনাম ছিল?**
- ক. কার্পাস
- খ. পত্রোর্ণ
- গ. ক্ষৌম
- ঘ. দুকূল

২. **সুলতানি আমলে বাংলার কোন ক্ষেত্রে ইরানি তুরানি প্রভাব বেশি লক্ষ করা যায়?**
- ক. সাহিত্য কর্মে
- খ. স্থাপত্য শিল্পে
- গ. উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে
- ঘ. তাঁত শিল্পে

৩. **কীর্তনগান রচনায় মুসলমান কবিগণও অংশগ্রহণ করেছিলেন। কেননা সুলতানি আমলে—**
- i . হিন্দু মুসলমানদের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ
- ii. শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ভাবধারার প্রভাব ছিল ব্যাপক
- iii. এটিই বাঙালির প্রথম সাহিত্য কর্ম ছিল

নিচের কোনটি সঠিক?
- ক. i
- খ. ii
- গ. i ও ii
- ঘ. i ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

মনু মাঝি নৌকা বাইছে। নতুন ধানে ভরা তার নৌকা। মনের সুখে গলা ছেড়ে গাইছে বাংলার চির পরিচিত একটি গান।

‘মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে
আমি আর বাইতে পারলাম না।

৪. **মনু মাঝি কোন ধরনের গান গাইছেন ?**
- ক. মুর্শিদি
- খ. বারমাস্যা
- গ. ভাওয়াইয়া
- ঘ. বাউল

৫. মনু মাঝির গানের মধ্যে কোনটি বেশি প্রকাশ পেয়েছে?

ক.	আধ্যাত্মিক সাধনা	গ.	নৈসর্গিক অবস্থা
খ.	নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য	ঘ.	সাহিত্য শিল্পের চর্চা

সৃজনশীল প্রশ্ন

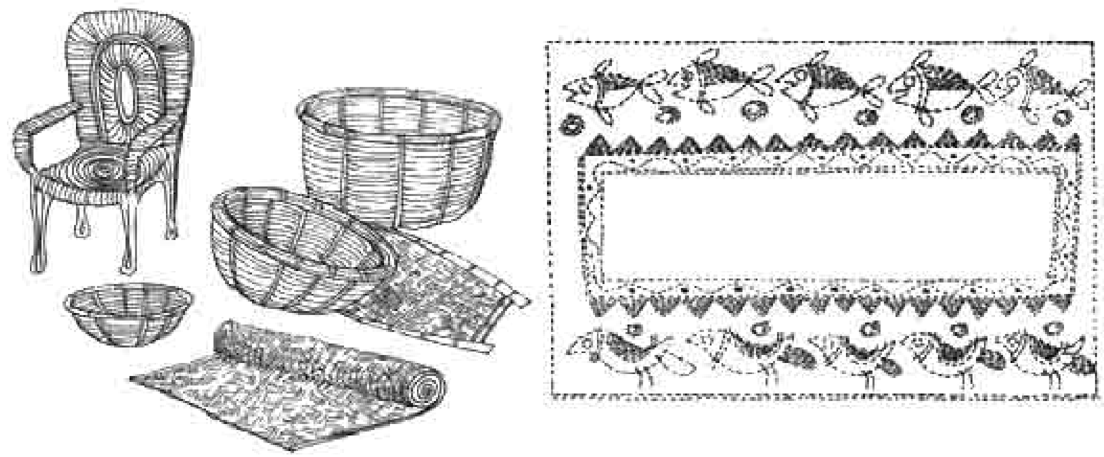

১. চিত্র : বাঙালির সংস্কৃতি ও শিল্পকলার নিদর্শন

ক. টেরাকোটা কী ?

খ. পাল যুগে তালপাতায় আঁকা ছবিগুলো এখনও ঝকমকে রয়েছে কেন?

গ. উদ্দীপকে বাংলার কোন শিল্পের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? বর্ণনা কর।

ঘ. উদ্দীপকের শিল্পকর্ম এখনও টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বাংলার নারীদের অবদান মূল্যায়ন কর।

অধ্যায়–চার

ঔপনিবেশিক যুগের প্রত্নপরিচয়

পাঠ–১ : ঢাকা শহরের প্রত্ননিদর্শন

বাংলাদেশে প্রায় দুশ বছরের ইংরেজ শাসনামলই (১৭৫৭–১৯৪৭) ঔপনিবেশিক যুগ হিসেবে চিহ্নিত। যদিও এরপর আরও প্রায় দুই দশক আমাদেরকে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে কাটাতে হয়েছে। ইংরেজ আমলে এদেশে বেশকিছু সুদৃশ্য অট্টালিকা ও অন্যান্য প্রত্ননিদর্শন তৈরি হয়েছিল। 'প্রত্ন' শব্দের অর্থ হলো পুরনো বা প্রাচীন। প্রত্নসম্পদ বলতে পুরনো স্থাপত্য ও শিল্পকর্ম, মূর্তি বা ভাস্কর্য, অলঙ্কার, প্রাচীন আমলের মুদ্রা, পুরনো মূল্যবান আসবাবপত্র ইত্যাদিকে বোঝায়। এসব নিদর্শনের মধ্য দিয়ে সেকালের মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা, জীবনযাত্রা, বিশ্বাস–সংস্কার, রুচি বা দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

ঔপনিবেশিক যুগের ঢাকার স্থাপত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু মসজিদ, মন্দির ও গির্জা। ঢাকার মসজিদগুলো মোঘল স্থাপত্যরীতিতে তৈরি। তবে এর সঙ্গে কিছুটা ইউরোপীয় রীতিও যোগ হয়েছে। উনিশ শতকে তৈরি ঢাকার উল্লেখযোগ্য মসজিদের মধ্যে রয়েছে লালবাগ (হরনাথ ঘোষ রোড) মসজিদ, লক্ষ্মীবাজার মসজিদ, সূত্রাপুরের কলুটোলা জামে মসজিদ, বেচারাম দেউড়ি মসজিদ, কায়েতটুলি মসজিদ এবং সূত্রাপুরের সিতারা বেগম মসজিদ। এগুলোর নির্মাণকলা ও নানা কারুকাজ চমৎকার। লক্ষ্মীবাজারের চনি টিকার মসজিদও স্থাপত্যশিল্পের চমৎকার নিদর্শন। ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত শিয়াদের ইমাম বাড়া হোসেনি দালান ইংরেজ আমলে নতুন করে নির্মিত হয়।

ঢাকা শহরের বিখ্যাত ঢাকেশ্বরী মন্দির ও রমনা কালীমন্দির ঔপনিবেশিক যুগের আগের তৈরি। রমনার কালী মন্দিরটি অবশ্য ঔপনিবেশিক আমলে আবার নতুন করে নির্মিত হয়েছিল।

আঠারো–উনিশ শতকে ঢাকা শহরে তৈরি হয় বেশ কয়েকটি গির্জা। এর মধ্যে সবচেয়ে পুরনো হলো আর্মেনিয়ান চার্চ। এটি তৈরি হয় আরমানিটোলায় ১৭৮১ সালে। উনিশ শতকে ঢাকায় নির্মিত হয় সেন্ট টমাস এ্যাংলিকান চার্চ ও হলিক্রস চার্চ। এছাড়াও ঢাকার পুরনো স্থাপত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে সদরঘাট এলাকায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে অবস্থিত বাহাদুর শাহ পার্ক। উনিশ শতকের মাঝামাঝি ঢাকার নওয়াব আবদুল গণি এ পার্ক তৈরি করে ব্রিটেনের রাণী ভিক্টোরিয়ার নামে এর নাম দেন ভিক্টোরিয়া পার্ক। তার আগে এ জায়গাটির নাম ছিল আন্টাঘর ময়দান। আন্টাঘর ময়দানের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ১৮৫৭ সালের প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস। ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর এদেশীয় সৈন্যরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করেন। ইংরেজরা একে বলে সিপাহী বিদ্রোহ। যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যরা জিততে পারেন নি। বিদ্রোহী সৈন্যদের যাঁরা ঢাকায় ইংরেজদের হাতে বন্দী হন তাঁদের ইংরেজরা এই আন্টাঘর ময়দানে গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেয়। এই ঘটনার ঠিক একশো বছর পর ১৯৫৭ সালে স্বাধীনতার জন্য প্রাণদানকারী সৈনিকদের স্মৃতিতে এখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়। ভারতবর্ষের শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের নামে পার্কটির নাম হয় বাহাদুর শাহ পার্ক ।

ঢাকার প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তির আরেকটি বিখ্যাত নিদর্শন বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ঢাকার নওয়াবদের তৈরি প্রাসাদ আহসান মঞ্জিল। এছাড়া জমিদার ও বণিকদের তৈরি পুরনো ঢাকার রূপলাল হাউস এবং রোজ গার্ডেনও চমৎকার স্থাপত্যকর্ম। অফিস বাড়ি হিসেবে ঢাকায় যেসব ভবন তৈরি হয়েছিল তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর হচ্ছে কার্জন হল। ইংরেজ আমলে তৈরি এ ভবনটি বহুকাল ধরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের অংশ। পুরনো হাইকোর্ট ভবনটিও ইংরেজ আমলে তৈরি।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : ঢাকা শহরের কয়েকটি প্রধান প্রত্ননিদর্শনের নাম উল্লেখ কর।

পাঠ–২ : ঢাকার বাইরের স্থাপত্য নিদর্শন

পানাম নগর

সুলতানী আমলে বাংলার রাজধানী ছিল সোনারগাঁও। পরবর্তী মোঘল যুগে এর গুরুত্ব কমে যায়। কিন্তু তখনো মসলিন শাড়ির উৎপাদন ও ব্যবসাকেন্দ্র হিসাবে এর খ্যাতি ছিল। উনিশ শতকে ধনী ব্যবসায়ীদের অনেকে বসবাসের জন্য সোনারগাঁওয়ের পানাম এলাকাটি বেছে নেন। এরা পানামের মূল সড়কের দুইপাশে সারিবদ্ধভাবে অনেকগুলো ইমারত নির্মাণ করেন। পানামনগরে এখনও এ রকম ৫২টি ইমারত টিকে আছে। চওড়া পথের দুই পাশে ইমারতগুলো সুন্দরভাবে সাজানো। পথের উত্তর পাশে ৩১টি এবং দক্ষিণপাশে রয়েছে ২১টি ইমারত। এর মধ্যে কয়েকটি বর্তমানে ধসে গেছে। এলাকার নিরাপত্তার জন্য পানামের অধিবাসীরা ইমারতগুলোর চারপাশ ঘিরে পরিখা বা খাল খনন করেছিল। ব্রিটিশ আমলে নির্মিত এই ভবনগুলিতে ইউরোপীয় স্থাপত্য রীতি অনুসরণ করা হয়। তবে এদের নির্মাণকলায় মোঘল স্থাপত্যেরও প্রভাব আছে। অট্টালিকাগুলো সাজানো হয়েছিল রঙিন মোজাইকে।

সরদারবাড়ি

পানামের আশেপাশে আরও কয়েকটি চমৎকার ইমারত এখনও টিকে আছে। এগুলো তৈরি করেছিলেন স্থানীয়

জমিদার ও ব্যবসায়ীরা। এগুলোর মধ্যে সরদারবাড়ি, আনন্দমোহন পোদ্দারের বাড়ি ও হাসিময় সেনের বাড়ি উল্লেখযোগ্য।

সরদারবাড়ি বা বড় সরদারবাড়িতে এখন স্থাপিত হয়েছে লোকশিল্প জাদুঘর। এ বাড়ির নির্মাণকাল ১৯০১ সাল। এটি তৈরি হয়েছে দুটি বড় প্রাসাদকে নিয়ে। একটি করিডোর বা লম্বা বারান্দা দিয়ে প্রাসাদ দুটি একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। দোতলা এই বাড়িতে রয়েছে ৭০টি কক্ষ। রঙিন মোজাইকের নানা কারুকাজে শোভিত হয়েছে সরদারবাড়ি।

সোনারগাঁওয়ের বাইরেও বাংলাদেশের নানা জায়গায় জমিদারদের তৈরি কিছু অনুপম সুন্দর প্রাসাদ ও স্থাপত্য নিদর্শন রয়েছে। যার মধ্যে ময়মনসিংহের শশীলজ একটি। মুক্তাগাছার জমিদাররা এটি তৈরি করেছিলেন। মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায় বালিয়াটির জমিদারবাড়িও সে রকম আরেকটি চমৎকার স্থাপত্যকর্মের নিদর্শন । রংপুরের তাজহাট জমিদার বাড়িও বেশ বিখ্যাত। নাটোরের দিঘাপতিয়ার জমিদারের প্রাসাদও তার চমৎকার স্থাপত্যকর্মের জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এটি এখন উত্তরা গণভবন নামে পরিচিত। তাজহাট ও নাটোরের দুটি প্রাসাদই বর্তমানে দেশের মূল্যবান স্থাপত্যকীর্তির নিদর্শন হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : ঢাকার বাইরের কয়েকটি স্থাপত্যকীর্তির উল্লেখ কর।

পাঠ–৩ : জাদুঘরে সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদ

বাংলাদেশের পুরাকীর্তিগুলো থেকে পাওয়া অনেক প্রত্ননিদর্শন জাদুঘরে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করা হয়। এ সব প্রত্নসম্পদ দেখে দেশের পুরোনো ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণালাভ করা যায়। ঢাকায় রয়েছে আমাদের জাতীয় জাদুঘর। এছাড়া নানা প্রত্নস্থলের সংগ্রহশালায়ও রয়েছে প্রচুর প্রত্নসম্পদ।

জাতীয় জাদুঘর

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের গ্যালারিতে সংরক্ষিত রয়েছে বাংলার নবাব, জমিদার ও ইংরেজ শাসনকালের বেশ কিছু প্রত্নসম্পদ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দিনাজপুরের মহারাজার ব্যবহার করা দ্রব্য ও হাতির দাঁতের কারুকাজ করা শিল্পদ্রব্য। বলধার জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরীর সংগ্রহ থেকে আনা পোশাক, হাতির দাঁতের নানা কারুকাজ ও ঢালতলোয়ারও জাদুঘরে স্থান পেয়েছে। এছাড়া

এখানে রাখা হয়েছে নাটোরের দিঘাপতিয়ার জমিদারদের ব্যবহার করা দ্রব্য, পোশাক, ঢালতলোয়ার ও সিংহাসন এবং ঢাকার নওয়াবদের ব্যবহার করা কারুকার্যখচিত পোশাক ও জিনিসপত্র।

কোনো কোনো আঞ্চলিক জাদুঘর ও সংগ্রহশালায় নানা প্রত্ননিদর্শন প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছে। অধিকাংশ সংগ্রহশালাই জমিদারদের পুরোনো প্রাসাদে অবস্থিত। জমিদারদের ব্যবহার করা নানা দ্রব্য এবং তাদের সংগ্রহ করা নানা প্রত্নসম্পদ সেখানে প্রদর্শন করা হয়।

ঢাকার আহসান মঞ্জিলে রয়েছে একটি সংগ্রহশালা। সেখানে ঢাকার নওয়াবদের পোশাক, খাট–পালঙ্ক, চেয়ার, সোফা, অলঙ্কার ও আলোকচিত্র স্থান পেয়েছে। ময়মনসিংহ শহরে জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এটি পরিচালনা করে। বৃহত্তর ময়মনসিংহের জমিদারদের ব্যবহার করা জিনিসপত্রই এখানে স্থান পেয়েছে বেশি।

মুক্তাগাছার জমিদারদের প্রত্নসম্পদ ময়মনসিংহ জাদুঘরে বেশি। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পাথরের ফুলদানি, কম্পাস, ঘড়ি, অলঙ্কার, মৃৎপাত্র, কাপড়বোনার যন্ত্র, লোহার সিন্দুক, খেলার সরঞ্জাম, সরস্বতী ও বিষ্ণুমূর্তি, বাঘ, ড্রাগন, বন্য ষাড় ও হরিণের মাথা, সোফাসেট ও ইটালিতে তৈরি মূর্তিও এ জাদুঘরে স্থান পেয়েছে।

রংপুরের তাজহাট জমিদারদের প্রাসাদেও রয়েছে একটি সংগ্রহশালা। তাজহাট জমিদারদের ব্যবহার করা দ্রব্যসামগ্রী, পোড়ামাটির কাজ, সংস্কৃত ও আরবি ভাষায় লেখা পাণ্ডুলিপি স্থান পেয়েছে এই সংগ্রহশালায়।

কুষ্টিয়ার শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের কুটিবাড়িতে স্থান পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিজড়ানো নানা জিনিস এবং আলোকচিত্র।

জাদুঘর ও সংগ্রহশালায় রাখা বিভিন্ন প্রত্ননিদর্শন দেখে সে যুগের অভিজাত শ্রেণির মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে আমরা ধারণালাভ করতে পারি।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত প্রত্মনির্দশনগুলোর তালিকা দাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. **বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক যুগ ছিল কোনটি?**

ক. ১৭৫৭–১৮৫৭ গ. ১৭৮১–১৮৫৭

খ. ১৭৫৭–১৯৪৭ ঘ. ১৮৫৭–১৯৫৭

২. **সোনারগাঁও এর পানাম নগরটি ছিল—**

i. সুলতানী আমলে বাংলার কেন্দ্রস্থল

ii. ইউরোপীয় স্থাপত্য রীতিতে তৈরি ইমারতের সারিবন্ধ রূপ

iii. চওড়াপথের ধারে নিরাপত্তার জন্য রক্ষিত পরিখাসমৃদ্ধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i গ. i ও ii
খ. ii ঘ. i ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হলে শিক্ষক আজাদ সাহেব শিক্ষার্থীদের নিয়ে শাহবাগে একটি ভবন পরিদর্শনে যান। ভবনটিতে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীরা বইয়ে পড়া প্রাচীন নিদর্শনগুলো বাস্তবে দেখে খুবই অভিভূত হয়।

৩. **আজাদ সাহেব শিক্ষার্থীদের কোন ভবন পরিদর্শনে নিয়ে যান?**
ক. বাংলা একাডেমী গ. জাতীয় গ্রন্থাগার
খ. শিল্পকলা একাডেমী ঘ. জাতীয় যাদুঘর

৪. **আজাদ সাহেব শিক্ষার্থীদেরকে এ ধরনের ভবন পরিদর্শনে নেওয়ার কারণ হলো —**
i. জমিদারদের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি প্রদর্শন
ii. ইতিহাসের চরিত্রগুলোর সাথে পরিচিত করানো
iii. বিভিন্ন আমলের ঐতিহ্যকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i গ. ii ও iii
খ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অর্ণব ও অর্পা ঈদের ছুটিতে টাঙ্গাইলের ধনবাড়িতে বেড়াতে গেল। সেখানে গিয়ে তারা টাঙ্গাইলের বিখ্যাত স্থানগুলো ভ্রমণের বায়না ধরল। মামা তাদের প্রথমেই নিয়ে গেলেন প্রাচীন মুসলিম জমিদার বাড়ি দেখাতে। জমিদার বাড়ির স্থাপত্য ও নকশা দেখে তারা মুগ্ধ হয়ে গেল। এরপর তারা দেখল টাঙ্গাইলের শাড়ী বুনন শিল্প। মামা জানালেন এ শাড়ীর কারণে টাঙ্গাইল আজ বিখ্যাত।

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি কোথায় অবস্থিত?
খ. প্রত্নতত্ত্ব বলতে কী বোঝায়?
গ. উদ্দীপকের শহরটির মতো এক সময় সোনারগাঁও বিখ্যাত থাকার কারণটি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. অর্ণব ও অর্পার দেখা জমিদার বাড়িটি মোঘল স্থাপত্যরীতিতে তৈরি — বিশ্লেষণ কর।

অধ্যায়—পাঁচ
সামাজিকীকরণ ও উন্নয়ন

প্রত্যেক সমাজের কিছু নিয়ম–রীতি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও আদর্শ রয়েছে। মানুষকে এগুলো আয়ত্ব করতে হয়। সমাজের এই নিয়ম–রীতি আয়ত্ব করার প্রক্রিয়াকেই বলা হয় সামাজিকীকরণ। এর মধ্য দিয়েই ব্যক্তি সমাজের নিয়ম–রীতি ও প্রত্যাশিত আচরণের উপযোগী হয়ে গড়ে ওঠে। সামাজিকীকরণ আসলে একটি চলমান প্রক্রিয়া। শৈশব থেকে মৃত্যু অবধি এটা চলতে থাকে।

পাঠ– ১ : সামাজিকীকরণে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রভাব

ব্যক্তির সুষ্ঠু বিকাশের জন্য সামাজিকীকরণ প্রয়োজন। জন্মের পর থেকেই মানব শিশু সমাজের নিয়ম–কানুন ও রীতিনীতি শিখতে থাকে। একেই বলা যায় তার সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া। এই অধ্যায়ে আমরা সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে কয়েকটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সম্পর্কে জানব।

স্থানীয় সমাজ : বাবা–মা বা পরিবারের পর স্থানীয় সমাজই শিশুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । চারপাশের মানুষের আচার–আচরণ ও রীতিনীতি দেখতে দেখতে শিশু বেড়ে উঠে। এভাবে সে সহজেই সমাজের রীতিনীতি শিখে যায়। স্থানীয় মানুষের ভাষাভঙ্গি ও মূল্যবোধ তার আচরণে প্রভাব ফেলে।

স্থানীয় সমাজের বিভিন্ন উপাদান : স্থানীয় সমাজের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে রয়েছে সাহিত্য সমিতি, সাংস্কৃতিক সংঘ, খেলাধুলার ক্লাব, সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্র, বিজ্ঞান ক্লাব প্রভৃতি। স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা এসব সংগঠন ব্যক্তির চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচার–আচরণের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। ব্যক্তি এসব সংগঠনের সঙ্গে নিজেকে জড়ায়। সংগঠনভুক্ত অন্যদের সঙ্গে মিশে তার বুদ্ধিবৃত্তি, সুকুমার বৃত্তি ও সৌন্দর্যবোধ জেগে উঠে। এই বোধ তাকে সহনশীল হতে শেখায়। এভাবেই ব্যক্তি স্থানীয় সমাজের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ায় এবং তাদের অংশ হয়ে উঠে।

সমবয়সী সঙ্গী : শিশুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সমবয়সী বন্ধু বা সঙ্গীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শৈশবে সমবয়সীদের সঙ্গে খেলাধুলার আকর্ষণ থাকে অপ্রতিরোধ্য। এভাবে খেলার সাথীরা একে অপরের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখে। কথাবার্তা, আচার–আচরণ ও চালচলনের ক্ষেত্রে তারা একে অন্যকে প্রভাবিত করে। এর মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে সহমর্মিতা, সহযোগিতা, সহনশীলতা ও নেতৃত্বের গুণগুলো বিকশিত হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পরস্পরের সাথে মিলিত হওয়ার পর্যাপ্ত সুযোগ পায়। এর মাধ্যমে একে অপরকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান : রাজনৈতিক দল, নেতৃত্ব এবং আন্দোলন–সংগ্রামও ব্যক্তির সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মানুষকে সচেতন ও সংগঠিত করার মাধ্যমে তারা এ কাজটি করে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা উল্লেখ কর।

পাঠ– ২ ও ৩ : ব্যক্তির সামাজিকীকরণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং গণমাধ্যমের ভূমিকা

জনগণের কাছে সংবাদ, মতামত ও বিনোদন পরিবেশন করা হয় যেসব মাধ্যমে তাকেই বলা হয় গণমাধ্যম। যেমন সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র। আর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলতে বোঝায় সেই প্রযুক্তি যার সাহায্যে তথ্য সংরক্ষণ ও তা ব্যবহার করা যায়। যেমন, ইন্টারনেট, ফোন প্রভৃতি। গণমাধ্যম এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যক্তির সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আজকের দিনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এর গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছে।

সংবাদপত্র : সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে সংবাদপত্র জনশিক্ষার একটি প্রধান মাধ্যম। আপন সমাজ ও বিশ্ব সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে তা মানুষের মনের সংকীর্ণতা দূর করে। তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহনশীলতা, সহমর্মিতা ও বিশ্বজনীনতার বোধ সৃষ্টি করে।

বেতার বা রেডিও : বেতার কেবল সংবাদই পরিবেশন করে না। শিক্ষা ও বিনোদনমূলক নানা অনুষ্ঠানও প্রচার করে। এর ফলে গণসচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের মধ্যে সংস্কৃতিবোধ সৃষ্টি হয়।

টেলিভিশন : আজকের দিনে সারা পৃথিবীতেই টেলিভিশন সবচেয়ে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় গণমাধ্যম। মানুষের চিন্তাভাবনা ও জীবনযাপনকে এটি নানাভাবে প্রভাবিত করে। টেলিভিশন বিনোদন এবং তথ্য ও শিক্ষামূলক নানা ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার করে নাগরিকদের আনন্দ ও শিক্ষা দেয়। সাধারণ মানুষ বিশেষ করে শিশু–কিশোরদের উপর টেলিভিশনের প্রভাব খুব বেশি। এই প্রভাব ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই রকমই হতে পারে। টেলিভিশনে যদি বেশি বেশি করে ও আকর্ষণীয়ভাবে শিক্ষা ও তথ্যমূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় তবে তা মানুষকে আলোকিত করে তুলতে পারে। আপন দেশ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে নবীন প্রজন্মের মানুষকে পরিচিত করে তোলার মাধ্যমে টেলিভিশন তাদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলতে পারে। এর ফলে সামাজিকীকরণের কাজটি সহজ হয়। অন্যদিকে টেলিভিশনের সস্তা বিনোদনমূলক বা কুরুচিপূর্ণ অনুষ্ঠান সমাজের বিশেষ করে শিশু–কিশোর মনের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। তারা অসুস্থ ও বিকৃত মন–মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠে। অতিরিক্ত বা রাত জেগে টেলিভিশন অনুষ্ঠান দেখার ফলে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার ক্ষতি হয়।

চলচ্চিত্র : সুস্থ, রুচিশীল ও শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র মানুষকে আনন্দ দেওয়ার পাশাপাশি তাদের মধ্যে মূল্যবোধ, মানবিকতা ও সহমর্মিতার বোধ জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে সামাজিকীকরণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। উল্টোদিকে অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ চলচ্চিত্র সমাজের মানুষের মূল্যবোধ ও রুচির অবনতি ঘটায়। সমাজের উপর যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। সামাজিকীকরণে সহায়তা করার পরিবর্তে তা সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং অপরাধ প্রবণতা ও বিশৃঙ্খলার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব : ইন্টারনেট প্রযুক্তি বর্তমানে দেশ বা দেশের বাইরে এক মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের যোগাযোগকে খুবই সহজ করে দিয়েছে। আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ভাববিনিময়, পরস্পরের খোঁজখবর নেয়া কিংবা ব্যবসায়িক প্রতিপক্ষের সঙ্গে পণ্যবিনিময় সংক্রান্ত আলোচনা, চুক্তি ইত্যাদি এখন ঘরে বসেও অল্প সময়েই করা যায়। কিছুদিন আগেও যা ভাবা যেত না। এভাবে ব্যক্তির সামাজিকীকরণে ও তার মাধ্যমে সমাজের উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ইলেক্ট্রনিক মেইল : ই-মেইল কথাটার সঙ্গে আমরা সবাই আজকাল পরিচিত। ই-মেইল হচ্ছে ইলেক্ট্রনিক মেইল কথাটার সংক্ষিপ্ত রূপ। এর মাধ্যমে খুব অল্প সময়ে ও কম খরচে দেশে-বিদেশে চিঠি ও তথ্য আদান–প্রদান করা যায়। ই-মেইল পৃথিবীব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যুগান্তর এনেছে। ব্যক্তির সামাজিকীকরণ ও তার মাধ্যমে সমাজের উন্নয়নে ই-মেইল বর্তমানে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। মেধা ও চিন্তার বিকাশ এবং পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে বর্তমানে ই-মেইলের কোনো বিকল্প নেই।

ইলেক্ট্রনিক কমার্স : ইলেক্ট্রনিক কমার্সকে সংক্ষেপে বলে ই-কমার্স। এ পদ্ধতিতে অনলাইনে ক্রেতা–বিক্রেতার মধ্যে পণ্য লেন-দেন করা যায়।

ফেসবুক ও টুইটার : ফেসবুক ও টুইটারের সাহায্যে খুব সহজে দেশে বা বিদেশে যে কোনো মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি এবং মতামত ও ছবি বিনিময় করা যায়। আধুনিক বিশ্বে এটি সামাজিক যোগাযোগের একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। আর দিন দিন এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তবে বিজ্ঞানের অন্য অনেক আবিষ্কারের মতো ইন্টারনেট, ফেসবুক ও টুইটারেরও কিছু মন্দ বা নেতিবাচক দিক আছে। মানুষের হাতে এগুলোর অপব্যবহার ব্যক্তি ও সমাজ দুয়ের জন্যই মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। আজকাল প্রায়ই তরুণসমাজের উপর ইন্টারনেট ও ফেসবুকের নেতিবাচক প্রভাবের কথা শোনা যাচ্ছে। এ বিষয়ে আমাদের অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : শিশুর সামাজিকীকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা উল্লেখ কর।

কাজ–২ : ব্যক্তির সামাজিকীকরণে ই-মেইলের প্রভাব উল্লেখ কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. **স্থানীয় সমাজের উপাদান কোনটি?**

ক. বিজ্ঞান ক্লাব
খ. ইউনিয়ন পরিষদ
গ. জাতীয় সংসদ
ঘ. সিটি কর্পোরেশন

২. **সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া চলতে থাকে—**

ক. শৈশব থেকে কৈশোর পর্যন্ত
খ. শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত
গ. কৈশোর থেকে যৌবন পর্যন্ত
ঘ. শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

মহসিন বাবা মায়ের প্রচেষ্টায় নিয়মিত পড়াশুনা করে। সে এখন আবৃত্তি দলের সদস্য হয়ে কাজ করছে। তার মা লক্ষ করলো যে সে এখন পরিবারের সদস্য ও বন্ধুবান্ধবের সাথে আগের চেয়ে ভালো ব্যবহার করছে।

৩. **মহসিনের পরিবর্তনে কোন প্রক্রিয়াটি কাজ করেছে?**

ক. সামাজিকীকরণ গ. রাজনৈতিক
খ. অর্থনৈতিক ঘ. পারিবারিক

৪. **উক্ত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি —**

i . সমাজের নিয়ম পালনে অভ্যস্ত হয়ে গড়ে উঠে
ii. সঠিক আচরণ করতে শিখে
iii. সুনাগরিক হয়ে গড়ে ওঠে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i গ. ii
খ. iii ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মিজান ও রাসেলের বন্ধু শিহাব ৮ম শ্রেণির ছাত্র। শিহাব আন্তঃহাউজ ইনডোর প্রতিযোগিতায় দাবায় পর পর দুইবার প্রথম হয়েছে। রাসেল শিহাবের অনুপ্রেরণায় দাবা শিখে সেও এই বৎসর দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে। মিজান ইদানিং প্রায়ই স্কুলে দেরি করে আসে। বাড়ির কাজ ঠিকমতো করে নিয়ে আসে না। শিক্ষক মিজানের মায়ের কাছে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারে মিজান রাত জেগে ইন্টারনেট ব্যবহার করে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়।

ক. গণমাধ্যম কী?
খ. ব্যক্তির সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? ব্যাখ্যা কর।
গ. রাসেল দাবায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারের ক্ষেত্রে সামাজিকীকরণের কোন প্রতিষ্ঠানটি প্রভাব বিস্তার করেছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "মিজানের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির অপব্যবহার লক্ষ করা যায়"– বিশ্লেষণ কর।

অধ্যায়—ছয়

বাংলাদেশের অর্থনীতি

বাংলাদেশকে বলা হয় কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের বেশির ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। আর কৃষিই তাদের জীবিকার প্রধান উপায়। এছাড়াও গ্রামাঞ্চলে কিছু লোক তাঁতি, জেলে, কুমোর, কামার, মুদি দোকানদার ছোটোখাটো ব্যবসা করে জীবন ধারণ করে। শহরাঞ্চলের মানুষ প্রধানত চাকুরি ও ব্যবসা–বাণিজ্য করে। এছাড়াও শহরে বহু লোক রিক্সা, ঠেলা ও ভ্যানগাড়ি চালক, ছোট দোকানদার ও ফেরিওয়ালা, মুটে, মজুর ইত্যাদি হিসেবে জীবন ধারণ করে। এসব কাজ হয় ব্যক্তি উদ্যোগে। পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় মালিকানায়ও এদেশে কিছু কিছু শিল্পকারখানা এবং রেল, সড়ক ও নৌপরিবহন ব্যবস্থা চালু রয়েছে। আছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ সেবামূলক খাত। বর্তমানে বেসরকারি মালিকানায় দেশে অনেক শিল্পকারখানা ও ব্যবসা–প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। দেশের উন্নয়নে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তাছাড়া বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে এই খাত থেকে। এভাবে সরকারি ও বেসরকারি দুই খাতকে নিয়েই বাংলাদেশের অথনৈতিক জীবনধারা বিকশিত হচ্ছে।

একটি দেশ কতটা উন্নত বা অনুন্নত তা বিচার করা হয় কতগুলো সূচক বা মানদণ্ডের সাহায্যে। এই মানদণ্ডগুলো হলো দেশটির মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product : GNP), জনগণের মাথাপিছু আয় (Per Capita Income), জীবনযাত্রার মান প্রভৃতি। এই সব দিক বিচারে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি লাভ করছে। আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার প্রতি বছরই পূর্ববর্তী বছরগুলোকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে যেমন আছে আমাদের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন তেমনি আছে প্রবাসে কর্মরত শ্রমিক ও অন্যান্য চাকুরিজীবীদের অবদান। বাংলাদেশ ব্যাংকের এক হিসেবে দেখা যায়, ২০০৪–২০০৫ অর্থবছরে যেখানে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (Gross Domestic Product : GDP) পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৭০ হাজার ৭০৭ কোটি টাকা, সেখানে ২০০৯–২০১০ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬ লক্ষ ৯০ হাজার ৫৭১ কোটি টাকায়, অর্থাৎ দ্বিগুণেরও বেশি।

পাঠ– ১: উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য

দেশের কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির মূল লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি। দেশে উৎপাদন বাড়লে জনগণের জীবনযাত্রার উপর তার প্রভাব পড়বে। দারিদ্র্য হ্রাস পাবে, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে, কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে, বেকারত্ব হ্রাস পাবে। এর সঙ্গে যদি আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারটিকেও নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, তবে প্রবৃদ্ধির সূচকে আমাদের দেশ অনেক এগিয়ে যাবে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ– ১ : জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয় ধারণা দুটি ব্যাখ্যা কর।

পাঠ– ২ : বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে বিভিন্ন খাতের অবদান

বাংলাদেশে জাতীয় আয়ের উৎস হিসাবে আমরা অনেকগুলি খাতের নাম উল্লেখ করতে পারি। যেমন : কৃষি ও বনজ, মৎস্য, শিল্প, খনিজ, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি, নির্মাণ শিল্প, পাইকারি ও খুচরা বিপণন, হোটেল–রেস্তোরা, পরিবহন ও যোগাযোগ, ব্যাংক–বিমা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা, ব্যবসা–বাণিজ্য, শুল্ক প্রভৃতি। এর মধ্যে কয়েকটি খাতে আমাদের জাতীয় উৎপাদন ও আয়ের হিসাবে নিচে উল্লেখ করা হলো :

(ক) কৃষি ও বনজ : খাদ্যশস্য, শাকসজি ও বনজ সম্পদ এই খাতের অন্তর্ভুক্ত। ২০০৯–২০১০ অর্থবছরে আমাদের খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৬৯.৩৬ লক্ষ মেট্রিক টন। একই সময়ে আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদনে কৃষি ও বনজ খাতের অবদান ছিল ১৫.৬৫ শতাংশ।

(খ) মৎস্য খাত : ২০০৯–২০১০ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ নদী ও অন্যান্য জলাশয় এবং সামুদ্রিক উৎস থেকে মাছ আহরণের পরিমাণ ছিল ২৮.৯৭ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশজ উৎপাদন বা জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ছিল ৪.৫১ শতাংশ।

(গ) শিল্প খাত : ২০০৯–২০১০ অর্থবছরে জাতীয় উৎপাদনে শিল্প খাতের অবদান ছিল ২৯.৯৫ শতাংশ। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি সরবরাহ, খনিজ সম্পদ ও নির্মাণ শিল্প প্রভৃতিকে এই খাতের অন্তর্ভুক্ত করা হলে তাতে জাতীয় অর্থনীতিতে এই খাতের অবদান অনেক বড় হয়।

(ঘ) পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য : ২০০৯–২০১০ অর্থবছরে জাতীয় আয়ে এই খাতের অবদান ছিল ১৪.৩০ শতাংশ।

(ঙ) পরিবহন ও যোগাযোগ : ২০০৯–২০১০ অর্থবছরে জাতীয় আয়ে এই খাতের অবদান ছিল ১০.৭৬ শতাংশ।

(চ) স্বাস্থ্য ও সেবা খাত : ২০০৯–২০১০ অর্থবছরে দেশজ উৎপাদন বা জাতীয় আয়ে এই খাতের অবদান ছিল ৪৯.৯০ শতাংশ।

গুরুত্ব

এককভাবে ধরলে আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদনে কৃষির অবদানই সর্বাধিক। তবে শিল্পের ভূমিকাও দিন দিন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এছাড়া সেবা খাতসমূহও দেশের অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখছে। বর্তমান বিশ্ব প্রযুক্তি-নির্ভর। কৃষি, শিল্প, যোগাযোগ, সেবা প্রভৃতি খাতের উন্নয়নে প্রযুক্তির বিকাশকে কাজে লাগিয়ে আমরা সহজেই আমাদের জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি

করতে পারি। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন খাতের উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় ও আয়ের ভারসাম্য রাখা গেলে জনগণের জীবনমানের উন্নয়নেও তা সহায়ক হবে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ– ১ : বাংলাদেশের মোট জাতীয় উৎপাদন বা আয় বৃদ্ধিতে যেসব খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে সেগুলোর একটি তালিকা তৈরি কর এবং খাতওয়ারি অবদানের বিবরণ দাও।

পাঠ– ৩ : মানব সম্পদ উন্নয়ন

মানুষ তখনই সমাজ বা রাষ্ট্রের শক্তিতে পরিণত হয় যখন সে সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্য কিছু করতে পারে। কেউ শারীরিক শ্রম দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য সম্পদ তৈরি কিংবা তাতে সহায়তা করে। কেউ মেধা দিয়ে নতুন নতুন সম্পদ উদ্ভাবন কিংবা তাতে সহায়তা করে। এভাবে যারা শ্রম বা মেধা দিয়ে দেশের কৃষি, শিল্প, সেবাসহ যে-কোনো খাতে অবদান রাখে তাদেরকে দেশের মানব সম্পদ বলা হয়। অদক্ষ মানুষকে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির সাহায্যে দক্ষ মানুষ অর্থাৎ মানব সম্পদে রূপান্তরিত করা যায়। একটি দেশের জনসংখ্যা এভাবে জনসম্পদে পরিণত হয়।

বাংলাদেশে মানব সম্পদ উন্নয়নে করণীয়

বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যাকে জনশক্তি অর্থাৎ মানব সম্পদে পরিণত করা গেলে তাতে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। এ লক্ষ্যে একটি সুচিন্তিত মানব সম্পদ উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন ও তার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্র ও সমাজকে উদ্যোগী হতে হবে। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে ও উপায়ে মানব সম্পদ উন্নয়নের এই কাজটি করা যায় :

(ক) শিক্ষা : শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার। যদিও আমাদের দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ নানা কারণে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। শিক্ষার অভাবে তারা অসচেতন ও অদক্ষ। এর ফলে শুধু যে তারা নিজের ও পরিবারের উন্নতি করতে পারছে না তাই নয় সমাজ ও দেশের উন্নয়নেও সঠিক ভূমিকা রাখতে পারছে না। মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের প্রদত্ত সুযোগ–সুবিধাগুলো যাতে দেশের প্রতিটি নাগরিক গ্রহণ করতে পারে প্রথমেই তা নিশ্চিত করতে হবে। সেই সঙ্গে দেশে আরও স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কৃষি, মেডিক্যাল ও প্রকৌশল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নারী ও অন্যান্য পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর শিক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় সহায়তার পরিমাণ আরও বাড়াতে হবে। দরিদ্র ও নিম্নবিত্তদের জন্য আর্থিক সহযোগিতা ও উপবৃত্তির সুযোগ আরও বৃদ্ধি করতে হবে।

(খ) যুব উন্নয়ন : দেশের লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও শিক্ষিত বেকার তরুণ–তরুণীকে বিভিন্ন পেশায় স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে আত্মকর্মসংস্থানে সক্ষম জনশক্তিতে পরিণত করা সম্ভব। এ ব্যাপারে বিদ্যমান সুযোগ–সুবিধাগুলো যাতে সবার কাছে সহজলভ্য হয় এবং আরও সুযোগ সৃষ্টি করা যায় তার জন্য সরকার ও সমাজকে উদ্যোগী হতে হবে।

(গ) শ্রম ও কর্মসংস্থান : আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ তরুণ বর্তমানে বিদেশে চাকরি করতে যাচ্ছে। এদের মধ্যে অদক্ষ শ্রমিক যেমন আছে, তেমনি আছে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার শিক্ষক প্রভৃতি পেশাজীবীও। কঠোর পরিশ্রমে তারা সেসব দেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করছে ও তার একটি অংশ নিয়মিত দেশে পাঠাচ্ছে। এভাবে তারা আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিরাট অবদান রাখছে। আমাদের দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক এবং বিভিন্ন পেশাজীবীদের বিদেশে অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি আগামীতেও মানব সম্পদ উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে। দেশের অনগ্রসর বা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য চাকরিতে বিশেষ কোটা সংরক্ষণের সরকারি নীতির মূলেও মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যই কাজ করছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ– ১ : মানব সম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশের গৃহীত কার্যক্রমের একটি তালিকা দাও।

পাঠ– ৪ : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবাসীদের আয়

প্রবাসী আয় বা রেমিটেন্স

প্রবাসে কর্মরত নাগরিকদের স্বদেশে প্রেরিত অর্থকে রেমিটেন্স (Remittance) বলে। বিদেশে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী ও পেশাজীবীরা তাদের অর্জিত অর্থের একটা অংশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবারের কাছে পাঠায়। এই অর্থ কেবল তাদের পরিবারের প্রয়োজনই মেটায় না, কিংবা তাদের জীবনযাত্রার মানই বাড়াচ্ছে না, নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের একটি বড় অংশ আসছে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্স থেকে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিটেন্স

বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাজ করছে। মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, মিসর, লিবিয়া, মরক্কোসহ অনেকগুলো দেশে বাংলাদেশের শ্রমিক ও পেশাজীবীরা কাজ করছেন। একইভাবে নিকট ও দূরপ্রাচ্যের মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ব্রুনাই, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলোতেও বাংলাদেশের বহু মানুষ নানা পেশায় নিয়োজিত আছে। ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকাতেও বহু বাংলাদেশি চাকরি ও ব্যবসাসহ নানা ধরনের কাজ করছেন। বাংলাদেশ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর হিসেব অনুযায়ী ২০১০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বিদেশে বাংলাদেশের ৫৯ লাখ মানুষ কর্মরত ছিলেন। ২০০৮–২০০৯ অর্থবছরে প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশিদের কাছ থেকে আমাদের প্রাপ্ত রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল ৯ হাজার ৬৮ শত ৯১৬ কোটি মার্কিন ডলার। বিশ্বব্যাংকের হিসেব মতে ২০০৮ সালে বিশ্বের সর্বোচ্চ রেমিটেন্স প্রাপ্ত দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১২তম। ২০০৯ সালে তা ৮ম স্থানে উন্নীত হয়। এ সময় সার্কভুক্ত

দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের স্থান ছিল ২য়। বিশ্ব মন্দা পরিস্থিতি সত্ত্বেও ২০০৮–২০০৯ অর্থ বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি যে বড় ধরনের কোনো সংকটের মধ্যে পড়ে নি তার অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রবাসীদের পাঠানো বিপুল অঙ্কের রেমিটেন্স।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ– ১ : রেমিটেন্স কীভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. **২০০৯–২০১০ অর্থবছরে GDP–তে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতের অবদান কত শতাংশ?**

ক. ২৯.৯৫ গ. ১৪.৩০
খ. ১৫.৬৫ ঘ. ১০.৭৬

২. **বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূলে রয়েছে—**

i. প্রবাসীদের আয়
ii. দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি
iii. শিল্পের কাঁচামাল আমদানি বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii গ. ii ও iii
খ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

হারুণ দরিদ্র পরিবারের সন্তান। তার বাবা লেখাপড়ার খরচ বহন করতে না পারায় এক পর্যায়ে সে লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। পরে শেখ হাসিনা জাতীয় যুবকেন্দ্র, সাভার থেকে পশুপালনের উপর প্রশিক্ষণ নেয়। গ্রামে ফিরে সামান্য কিছু ঋণ নিয়ে একটি গরুর খামার করে। এ থেকে তার লাভ হয়। হারুণকে দেখে উৎসাহিত হয়ে তার কয়েকজন বেকার বন্ধুও খামার করে। ফলে গ্রামবাসীদের অবস্থার উন্নতি হয়।

৩. **অর্থনীতির ভাষায় হারুণের পরিচয়—**

ক. আত্মকর্মী গ. সহকর্মী
খ. স্বাবলম্বী ঘ. শ্রমজীবী

৪. **উদ্দীপকে বর্ণিত কাজের মাধ্যমে হারুণ ও তার বন্ধুরা পরিণত হয়েছে—**

ক. জনশক্তিতে গ. পেশাজীবীতে
খ. শ্রমশক্তিতে ঘ. বিনিয়োগকারীতে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সুরুজ আলীর বাড়ি টাঙ্গাইলে। তার দুই বিঘা জমি আছে। এতে তিনি ডাল ও আলু চাষ করেন। বছর শেষে ফসল তুলে বাজারে বিক্রি করেন। এ থেকে তিনি প্রচুর লাভ করেন। অন্যদিকে আরমান হোসেন চট্টগ্রামে বাস করেন। তার একটি পোশাক তৈরির কারখানা আছে। তার পোশাক দেশের চাহিদা মিটিয়েও বিদেশে রপ্তানি হয়।

ক. GNP–এর পূর্ণরূপ কী?
খ. মাথাপিছু আয়ের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।
গ. সুরুজ আলীর কাজ জাতীয় আয়ের কোন উৎসের অন্তর্ভূক্ত? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে সুরুজ আলী ও আরমান হোসেনের কাজের অবদান মূল্যায়ন কর।

২. দরিদ্র গিয়াস উদ্দিনের দুই ছেলের নাম কামাল ও জামাল। কামাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া শেষ করে একটি সিরামিক কোম্পানীতে চাকরি নেয়। অন্যদিকে জামাল কাজের সন্ধানে মালয়েশিয়া যায়। মালয়েশিয়া থেকে জামালের পাঠানো টাকায় যেমন গিয়াস উদ্দিনের পরিবারে স্বচ্ছলতা আসে, তেমনি কিছু সঞ্চয়ও হচ্ছে। সাত বছর পর জামাল বড় অংকের টাকা নিয়ে দেশে ফিরে আসে এবং দুই ভাই একত্রে এবি সিরামিক কারখানা নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। এতে এলাকার অনেকের কর্মসংস্থান হয়।

ক. শিক্ষা কোন ধরনের অধিকার ?
খ. মানব সম্পদ বলতে কী বোঝায়?
গ. মালয়েশিয়া থেকে জামালের পাঠানো অর্থের ধরন ব্যাখ্যা কর।
ঘ. কামাল ও জামালের সর্বশেষ কর্ম প্রয়াসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

অধ্যায়—সাত

বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা

রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সরকার রাষ্ট্র গঠনের একটি উপাদান। পৃথিবীর প্রতিটি স্বাধীন দেশের নিজস্ব সরকার ব্যবস্থা রয়েছে। সরকার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। আবার প্রতিটি সরকারের রয়েছে কিছু অঙ্গ। এগুলোর মাধ্যমে রাষ্ট্র বিভিন্নমুখী কাজ করে থাকে। রাষ্ট্র পরিচালিত হয় সংবিধানে উল্লিখিত নীতিমালার ভিত্তিতে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয়। এতে আমাদের দেশ পরিচালনার নীতিমালাগুলো বিধৃত রয়েছে। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার এসব দিক সম্পর্কে আমরা জানতে পারব।

পাঠ: ১ সরকারের ধরন

রাষ্ট্রের অপরিহার্য চারটি মৌলিক উপাদানের একটি হচ্ছে সরকার। এটি রাষ্ট্রের মূল চালিকা–শক্তি। ইঞ্জিন ছাড়া যেমন জাহাজ চলতে পারে না তেমনি সরকার ছাড়া রাষ্ট্র চলে না। রাষ্ট্র পরিচালনার সকল কাজ সরকারের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

সরকারের শ্রেণিবিভাগ

সরকার সব রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান হলেও সব সরকারের ধরন এক নয়। যখন থেকে রাষ্ট্রের শুরু হয়েছে তখন থেকেই সরকারের ধরন একরকম ছিল না। যুগে যুগে সরকারের ধরন ও ধারণার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে। বর্তমানকালে সরকারকে পাশের ছক অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ করা হয়।

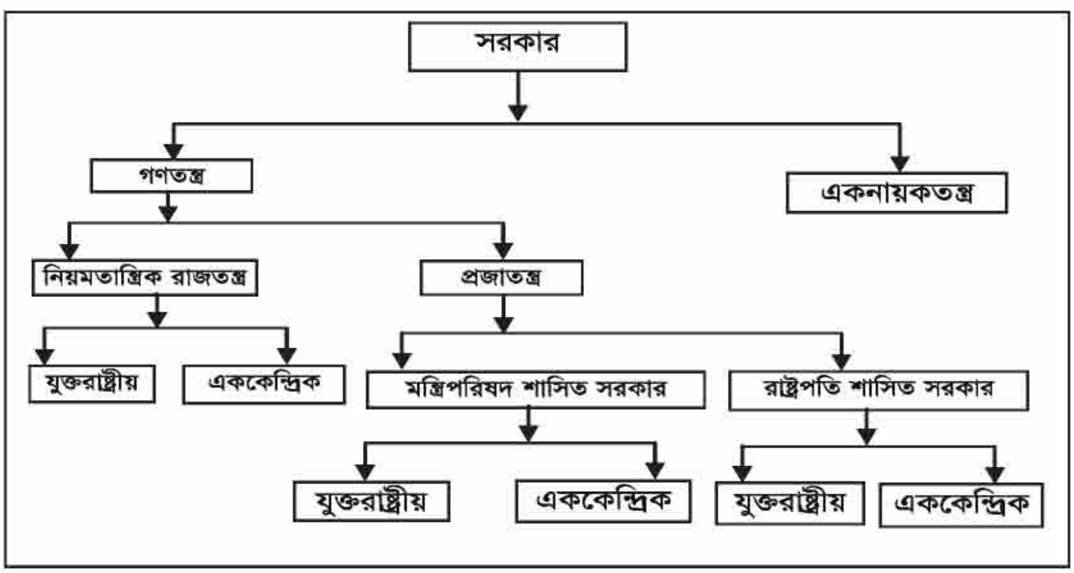

উপরের ছকে আমরা বিভিন্ন ধরনের সরকার-পদ্ধতি লক্ষ করি—

১. সরকারকে প্রধানত গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র–এ দুভাগে ভাগ করা যায়। গণতন্ত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে। এতে জনগণ সকল ক্ষমতার মূল উৎস। জনগণ তাদের পছন্দের রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিদের ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সরকার গঠন করে ও দেশ পরিচালনা করে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই এ ধরনের সরকার রয়েছে। অন্যদিকে একনায়কতন্ত্র হচ্ছে এক ব্যক্তির বা এক দলের শাসন। এতে জনগণের অধিকার ও মতামতের কোনো স্বীকৃতি নেই। এখানে একনায়ক বা এক দলের ইচ্ছা অনিচ্ছা দ্বারা দেশ পরিচালিত হয়।

২. রাষ্ট্রপ্রধান কীভাবে ক্ষমতা লাভ করবেন তার উপর ভিত্তি করে গণতান্ত্রিক সরকারকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রে বিভক্ত করা যায়। যে সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতা লাভ করেন সেটি হলো নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। আর জনগণের ভোটে পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারকে বলা হয় প্রজাতন্ত্র। এতে জনগণকে রাষ্ট্রের মালিক মনে করা হয়।

৩. ক্ষমতা বণ্টনের নীতির উপর ভিত্তি করে গণতান্ত্রিক সরকারকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, এককেন্দ্রিক সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার। যে সরকারে কেন্দ্রের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে তাকে বলে এককেন্দ্রিক সরকার। আর যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়।

৪. আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের আলোকে গণতান্ত্রিক সরকারকে দুভাগে ভাগ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার। প্রথমটিতে শাসন বিভাগ আইন বিভাগের উপর নির্ভরশীল ও তার কাছে দায়ী থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে শাসন বিভাগ আইন বিভাগের নিকট দায়ী বা তার উপর নির্ভরশীল থাকে না। এখানে রাষ্ট্রপতি তার মন্ত্রিপরিষদ নিয়ে সরাসরি দেশের শাসন–ব্যবস্থা পরিচালনা করেন।

বাংলাদেশ সরকার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

উপরের ধরনগুলোর ভিত্তিতে বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থার চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। পাশের ছকটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এদেশে প্রজাতান্ত্রিক সরকার

বিদ্যমান রয়েছে, যাতে জনগণ রাষ্ট্রের মালিক। দেশটি এককেন্দ্রিক। কোনো প্রদেশ নেই। এতে সংসদীয় তথা মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার বর্তমান রয়েছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : সরকার পদ্ধতির ধরনগুলো পোস্টার পেপারে চার্টের সাহায্যে উপস্থাপন করে শ্রেণিকক্ষের সামনে বা একপাশে ঝুলিয়ে দাও।

কাজ–২ : বাংলাদেশ যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তা দুটি উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ কর।

পাঠ ২ : বাংলাদেশের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য

সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার দলিল। একটি ভবন বা ইমারত যেমন এর নকশা দেখে তৈরি করা হয়, তেমনি সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। সরকার কী ধরনের হবে, নাগরিক হিসেবে আমরা কী অধিকার ভোগ করব, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ কী ক্ষমতা ভোগ করবে তার সবকিছুই এতে লিপিবদ্ধ থাকে। বাংলাদেশের সংবিধান রচনার ইতিহাসটি এরকম :

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হয় ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ। দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় অর্জিত হয়। ১৯৭২ সালের ১০ই এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। এতে ড. কামাল হোসেনকে সভাপতি করে একটি সংবিধান কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি মাত্র ছয় মাসের মধ্যে খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করে। ১৯৭২ সালের ৩০শে অক্টোবর গণপরিষদে এটি আলোচিত হয়। অবশেষে একই বছরের ৪ঠা নভেম্বর গণপরিষদে এটি চূড়ান্ত অনুমোদন পায়।

চিত্র : বাংলাদেশের সংবিধান

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতে, "এই সংবিধান লিখিত হয়েছে লাখো শহিদের রক্তের অক্ষরে"। তাই এটি আমাদের সবার কাছে একটি পবিত্র দলিল।

সংবিধান কোনো অপরিবর্তনশীল বিষয় নয়। সময়ের প্রয়োজনে এটি পরিবর্তিত এবং সংশোধিত হতে পারে। এ যাবৎ এটি মোট ১৫ বার সংশোধিত হয়েছে। সংবিধানের সর্বশেষ সংশোধনী (পঞ্চদশ) গৃহীত হয় ২০১১ সালের ৩০ শে জুন তারিখে।

আমাদের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোকে আমরা এভাবে তুলে ধরতে পারি :

১. **গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার:** বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভোম গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত হবে।

২. **সংসদীয় পদ্ধতির সরকার :** বাংলাদেশে মন্ত্রীপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় পদ্ধতির শাসনব্যবস্থা চালু থাকবে। এতে প্রকৃত শাসন ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে থাকবে ।

৩. **লিখিত সংবিধান :** এটি একটি লিখিত দলিল। এটি ১১ ভাগে বিভক্ত এবং তাতে ১৫৩টি অনুচ্ছেদ ও একটি প্রস্তাবনা আছে।

৪. **রাষ্ট্রীয় মূলনীতি :** এতে রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মূলনীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো হলো : জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ।

৫. **রাষ্ট্রধর্ম :** সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও অন্য সকল ধর্ম ও ধর্মের অনুসারীদের সমান মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

৬. **জাতি ও জাতীয়তা :** ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বাদে জাতি হিসাবে বাংলাদেশের জনগণ 'বাঙালি' নামে পরিচিত হবে এবং বাংলাদেশের নাগরিকদের পরিচয় হবে 'বাংলাদেশি'।

৭. **এককেন্দ্রিক সরকার :** দেশে এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকবে।

৮. **এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা :** সংবিধানে এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত ৩০০ জন সংসদ সদস্য ও তাদের দ্বারা নির্বাচিত ৫০জন মহিলা সংসদ সদস্য নিয়ে এ আইনসভা গঠিত হবে।

৯. **মৌলিক অধিকার :** সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের ও তা সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।

১০. **জনগণের সার্বভৌমত্ব :** সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ক্ষমতা পরিচালনা করবে।

১১. **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা :** সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।

১২. **সর্বজনীন ভোটাধিকার :** সংবিধানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ১৮ বছরের বেশি বয়সের সকল নাগরিককে ভোটাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

১৩. **নির্বাচন অনুষ্ঠান :** কোনো কারণে সংসদ ভেঙে গেলে বা অবলুপ্ত হলে সংবিধান অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪. **সংবিধান সংশোধন :** সংসদ সদস্যদের মোট সংখ্যার দুই–তৃতীয়াংশ ভোটে সংবিধান সংশোধন করা যাবে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : বাংলাদেশের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত কর।

কাজ–২ : বিদ্যালয় বা আশেপাশের অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের পাঠাগার থেকে বাংলাদেশের সংবিধান সংগ্রহ করে সংক্ষেপে এর পরিচিতি লেখ।

পাঠ ৩ : বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

১৯৭২ সালের মূল সংবিধান এবং সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি নিম্নরূপঃ

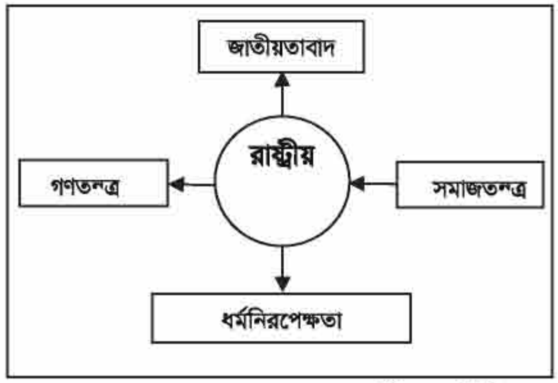

ছক : বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি

১. **জাতীয়তাবাদ** : একই ধরনের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বাঙালি জাতির মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য সৃষ্টি করেছে। তাই সংবিধানে বলা হয়েছে, একই ভাষা ও সংস্কৃতিতে আবদ্ধ বাঙালি জাতি যে ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে সেই ঐক্য ও সংহতি হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।

২. **সমাজতন্ত্র** : অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমতা আনার মাধ্যমে সবার জন্য সমান সুযোগ–সুবিধা নিশ্চিত করাই হলো এ মূলনীতির লক্ষ্য। শোষণমুক্ত ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রের একটি মূল ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

৩. **গণতন্ত্র** : রাষ্ট্রের সব কাজে নাগরিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই হলো গণতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি করার একটি প্রধান উদ্দেশ্য।

৪. **ধর্মনিরপেক্ষতা** : রাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষ যেন নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারে এবং কেউ যাতে অন্য কারো ধর্মপালনে বাধা না দিতে পারে সেজন্য ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

মূলনীতিগুলো রাষ্ট্র পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়। প্রতিটি নাগরিকের এগুলো মেনে চলা উচিত। এছাড়া সংবিধান রাষ্ট্র পরিচালনার পবিত্র দলিল। অতএব, একে সম্মান করা ও মেনে চলা প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এ দুটি মূলনীতি আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে কীভাবে অনুসরণ করতে পারি তার দুটি করে উদাহরণ দাও।

পাঠ ৪ : বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ

সরকার রাষ্ট্রের মূল চালিকা শক্তি। সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্র তার যাবতীয় কাজ সম্পাদন করে। সরকার ছাড়া রাষ্ট্র চলতে পারে না। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সরকার বিভিন্ন রকম কাজ করে। যেমন, নাগরিক হিসেবে আমাদের জন্য খাদ্য, শিক্ষা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। জনগণের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে। কেউ সে আইন ভাঙলে শাস্তির ব্যবস্থা করে। এ ধরনের আরও অনেক

কাজ আছে যা সরকার করে থাকে। সরকারের এ কাজগুলো সম্পাদনের জন্য এর তিনটি বিভাগ রয়েছে। এগুলোকে বলা হয় (১) আইন বিভাগ, (২) শাসন বিভাগ এবং (৩) বিচার বিভাগ।

সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ ও এদের গঠন

নিচের ছকে বাংলাদেশ সরকারের তিনটি বিভাগ–সংশ্লিষ্ট তিনটি ছবি দেওয়া আছে।

প্রথম ছবিটি জাতীয় সংসদ ভবনের। এটি ঢাকার আগারগাঁও–এ অবস্থিত। জাতীয় সংসদ বসে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা দেশ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করেন এবং অন্যান্য নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত নেন।

দ্বিতীয় ছবিটি বাংলাদেশ সচিবালয়ের। এখান থেকেই সরকারের শাসনকাজ পরিচালিত হয়।

শেষের ছবিটি সুপ্রিম কোর্টের। এটি হলো বাংলাদেশ সরকারের বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ কেন্দ্র। নিচে সরকারের এ তিনটি বিভাগের রূপরেখা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

জাতীয় সংসদ বাংলাদেশ সচিবালয় সুপ্রিম কোর্ট

আইন বিভাগ : বাংলাদেশের আইনসভা এক কক্ষবিশিষ্ট। এর নাম জাতীয় সংসদ। মোট ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে এটি গঠিত। এর মধ্যে ৩০০ জন সদস্য দেশের ৩০০টি নির্বাচনী এলাকা থেকে নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। বাকি ৫০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা তাঁরা নির্বাচিত হয়ে থাকেন। অর্থাৎ সংরক্ষিত আসনের মহিলা সাংসদগণ পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। তবে ৩০০টি নির্বাচনি এলাকার যে কোনোটিতেই মহিলারা সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বীতার মাধ্যমে নির্বাচিত হতে পারেন। জাতীয় সংসদের মেয়াদ পাঁচ বছর। জাতীয় সংসদে একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার থাকেন। জাতীয় সংসদের অধিবেশন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব স্পিকারের। ডেপুটি স্পিকার তাঁকে এ

কাজে সহায়তা করেন। এছাড়া স্পিকারের অনুপস্থিতিতে তিনি সংসদ অধিবেশনেও সভাপতিত্ব করেন। তাঁরা দুজনই সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে তাঁদের ভোটে নির্বাচিত হন।

শাসন বিভাগ : রাষ্ট্রের শাসনসংক্রান্ত কার্যাবলি পরিচালনার দায়িত্ব যে বিভাগ পালন করে তাকে শাসন বিভাগ বলে। ব্যাপক অর্থে, শাসনবিভাগ বলতে রাষ্ট্রের শাসন কাজে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা–কর্মচারীকে বোঝায়। এ অর্থে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে গ্রামের একজন চৌকিদার পর্যন্ত সকলেই শাসন বিভাগের অংশ। তবে প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান, মন্ত্রীপরিষদ ও সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের নিয়েই শাসন বিভাগ গঠিত।

বিচার বিভাগ : সরকারের যে অঙ্গ বা বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আইন অনুযায়ী বিচার কাজ পরিচালনা করে থাকে তাকে বলা হয় বিচার বিভাগ। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিচারালয়ের বিচারকদের নিয়ে এ বিভাগ গঠিত। বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ স্তর হলো সুপ্রিম কোর্ট। এর প্রধানকে 'বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি' বলা হয়। রাষ্ট্রপতি তাঁকে নিয়োগ দেন। সুপ্রিম কোর্টের রয়েছে দুটি বিভাগ। আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ। এ দুটি বিভাগের বিচারপতিগণও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গের রূপরেখার একটি তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি কর।

পাঠ ৫ : সরকারের বিভিন্ন অঙ্গের কাজ

পূর্ববর্তী পাঠে আমরা বাংলাদেশ সরকারের তিনটি অঙ্গের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লাভ করেছি। এ পাঠে আমরা এগুলোর কাজ সম্পর্কে একটু বিস্তৃতভাবে জানব।

আইন বিভাগ : আইন সভা বা জাতীয় সংসদ দেশের সাধারণ আইন তৈরি করে ও আইনের পরিবর্তন করে; দেশের জনমতকে প্রকাশ করে; সরকারের আয়–ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে; সংবিধান প্রণয়ন ও সংশোধন করে। রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হলে আইন বিভাগ তা বিচার বিবেচনা করে। এছাড়া দেশের জাতীয় তহবিলের অভিভাবক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে। জাতীয় বাজেট অনুমোদন ও কর ধার্য করে।

শাসন বিভাগ : শাসন বিভাগ আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন বাস্তবায়ন করে এবং সে অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করে। দেশের ভেতরে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখে। বিদেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব তথা প্রতিরক্ষার জন্য কাজ করে। কখনো কখনো আইনবিষয়ক ও বিচারসংক্রান্ত কাজ করে। শাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতি চরম শাস্তি (মৃত্যুদণ্ড) মওকুফ বা হ্রাস করতে পারেন। সরকারের আয়–ব্যয়ের হিসেব নিকেশ করে। দেশের শিক্ষা, কৃষি, শিল্প প্রতিষ্ঠা, ব্যবসা–বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, ভূমি সংস্কার, রাজস্ব ও কর আদায়সহ নানারকম জনকল্যাণমূলক কাজ করে। এছাড়া নানারকম উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করে থাকে।

বিচার বিভাগ : দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে বিচার কাজ পরিচালনা করে থাকে। দুষ্টের দমন, অপরাধীর শাস্তি বিধান ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে নাগরিক জীবনকে সুন্দর ও সহজ করে তোলে। বিভিন্ন মামলা মোকদ্দমার মীমাংসামূলক রায় দেয়। সংবিধানের বিভিন্ন ধারা বা আইনের ব্যাখ্যা দেয়। দেশের সংবিধান ও নাগরিক অধিকার রক্ষা করে এবং বিভিন্ন ধরনের তদন্তমূলক কাজ করে।

উপরের আলোচনায় আমরা লক্ষ করেছি যে, সরকারের প্রতিটি বিভাগের নিজস্ব কাজ ও তার পরিধি আছে। সে অনুযায়ী বিভাগগুলো পরিচালিত হয়। সকল বিভাগের সম্মিলিত রূপই হলো সরকার এবং সকল বিভাগের কাজ সরকারি কাজের অন্তর্ভুক্ত।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : নিচের ছকে সরকারের কয়েকটি কাজ উল্লেখ করা হয়েছে। কোনটি কোন বিভাগের কাজ চিহ্নিত কর ও নিচে লেখ।

কৃষির উন্নতির জন্য কাজ করে; মামলার মীমাংসামূলক রায় দেয়; আইন পরিবর্তন করে; দেশকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে; অপরাধীকে শাস্তি দেয়; সংবিধান প্রণয়ন করে।	
→ আইন বিভাগ :	১।
	২।
→ শাসন বিভাগ :	১।
	২।
→ বিচার বিভাগ :	১।
	২।

পাঠ ৬ : স্থানীয় সরকার

সাধারণভাবে স্থানীয় সরকার হলো স্থানীয় পর্যায়ে শাসন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার উন্নয়নের জন্য জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার ব্যবস্থা।

বর্তমানকালে রাষ্ট্রের আয়তন বড় ও লোকসংখ্যা বেশি হওয়ায় কেন্দ্রে বসে সরকারের পক্ষে আঞ্চলিক সকল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়ে উঠে না। তাই স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে এ ধরনের শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এতে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ কমে। স্থানীয় সমস্যার সমাধানও সহজ হয়। এটি বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

স্থানীয় সরকারের কাঠামো

বাংলাদেশে গ্রাম ও শহরাঞ্চল উভয় ক্ষেত্রেই স্থানীয় সরকার কাঠামো বিকশিত হয়েছে। পাশের ছকে উভয় অঞ্চলের স্থানীয় সরকারের কাঠামো দেখানো হলো।

স্থানীয় সরকার কাঠামো

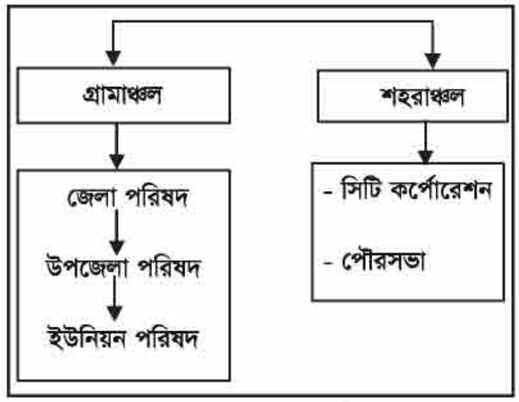

স্থানীয় সরকার কাঠামো

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে চার স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামো চালু আছে। এরমধ্যে সর্বনিম্ন স্তর হলো গ্রাম পরিষদ। এটি গ্রাম পর্যায়ে অবস্থিত। এর উপরের স্তর হলো ইউনিয়ন পরিষদ। এটি ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত। এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে আছে উপজেলা পরিষদ এবং জেলা পর্যায়ে আছে জেলা পরিষদ।

শহরাঞ্চলের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা দুই ধরনের– পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন। সিটি কর্পোরেশন দেশের সাতটি বিভাগীয় শহরে এবং পৌরসভাগুলো অন্যান্য শহর এলাকায় স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব পালন করে।

স্থানীয় সরকারের গঠন

একমাত্র জেলা পরিষদ ছাড়া স্থানীয় সরকারের অন্য সকল কাঠামোর নেতৃত্বই নির্বাচিত হন জনগণের সরাসরি ভোটে। এগুলোর প্রতিটিরই কার্যকাল পাঁচ বছর।

ইউনিয়ন পরিষদ : দেশে বর্তমানে ৪,৪৯৮টি ইউনিয়ন পরিষদ আছে। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একেকটি ইউনিয়ন গঠিত। ইউনিয়ন পরিষদ হলো গ্রাম এলাকার স্থানীয় সরকার। গ্রামীণ সমস্যা দূরীকরণ ও স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্বের বিকাশ ও গণসচেতনতা বৃদ্ধি এর মূল লক্ষ্য। নির্বাচিত ১ জন চেয়ারম্যান, ৯টি ওয়ার্ড থেকে ৯জন সদস্য ও সংরক্ষিত আসনে তিন জন মহিলা সদস্যসহ সর্বমোট ১৩জন নিয়ে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত।

পৌরসভা : শহর এলাকার স্থানীয় সরকার হিসেবে পৌরসভা গঠিত। বর্তমানে দেশে ৩০৯টি পৌরসভা আছে। একজন মেয়র, প্রতি ওয়ার্ড থেকে একজন করে কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের মহিলা কাউন্সিলরদের নিয়ে পৌরসভা গঠিত হয়। আয়তন ও জনসংখ্যার তারতম্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন পৌরসভার সদস্য সংখ্যা কম বা বেশি হতে পারে।

উপজেলা পরিষদ : কয়েকটি ইউনিয়ন নিয়ে একটি উপজেলা গঠিত হয়। উপজেলা পরিষদ গঠিত হয় একজন চেয়ারম্যান, উপজেলার অন্তর্ভুক্ত সব ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং সব মহিলা সদস্যের এক তৃতীয়াংশকে নিয়ে। দেশে বর্তমানে মোট উপজেলা পরিষদের সংখ্যা ৪৮৩।

জেলা পরিষদ : কয়েকটি উপজেলা নিয়ে একটি জেলা গঠিত। দেশে ৬৪টি জেলা থাকলেও জেলা পরিষদ আছে ৬১টি। একজন চেয়ারম্যান এবং ২০ জন সদস্য নিয়ে জেলা পরিষদ গঠিত। ২০ জন সদস্যের মধ্যে পাঁচ জন হবেন মহিলা। চেয়ারম্যানসহ সবাই পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। জেলার অন্তর্গত সব সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও কমিশনার, সব উপজেলার চেয়ারম্যান, সব পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলর এবং সব ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ তাঁদের নির্বাচিত করেন। জেলার অন্তর্ভুক্ত সংসদ সদস্যগণ হবেন জেলা পরিষদের উপদেষ্টা।

সিটি কর্পোরেশন : বাংলাদেশে সাতটি মহানগর আছে। এগুলো হলো : ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল ও রংপুর। প্রতিটিতে আছে একটি করে সিটি কর্পোরেশন। এছাড়া নারায়ণগঞ্জ ও কুমিল্লাতেও সিটি কর্পোরেশন রয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের প্রধানকে বলা হয় মেয়র। মেয়রের কাজে সাহায্যের জন্য আছেন কাউন্সিলর। সিটি কর্পোরেশনের আয়তনের ভিত্তিতে কাউন্সিলরদের সংখ্যা কম–বেশি হতে পারে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার গঠনের তুলনা ছকের সাহায্যে দেখাও।

পাঠ ৭ ও ৮ : স্থানীয় সরকারের কাজ

স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধিত্বমূলক। এটি স্বশাসিত ও সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণমুক্ত। জনহিতকর কাজ থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায়ের অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে স্থানীয় সরকার। স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি স্থানীয় সরকারের হাতে।

ইউনিয়ন পরিষদের কাজ

পাশের ছকে ইউনিয়ন পরিষদের কাজ দেখানো হলো।

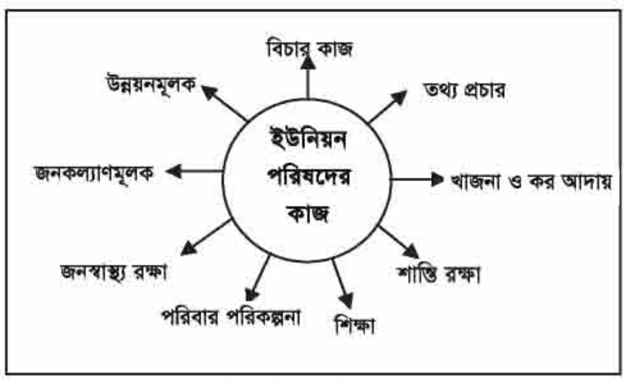

ছক : ইউনিয়ন পরিষদের কাজ

দেখা যাচ্ছে, ইউনিয়ন পরিষদ অনেক দায়িত্ব পালন করে। যেমন :

- ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা;
- ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা;
- ইউনিয়নের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা;

প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা ;

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন উপকরণ সহজলভ্য করার ব্যবস্থা;

গরিব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান, বয়স্কদের শিক্ষাদান, নিরক্ষরতাদূরীকরণ ইত্যাদির ব্যবস্থা ;

এলাকায় শান্তি –শৃঙ্খলা রক্ষা;

এলাকায় জমির খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা;

এলাকায় কোনো অপরাধ বা দুর্ঘটনা ঘটলে পুলিশকে জানানো এবং অপরাধের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি;

এলাকায় শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য ছোটখাট বিবাদ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা।

পৌরসভার কাজ

পৌরসভাগুলো ইউনিয়ন পরিষদের মতো জনস্বাস্থ্য রক্ষা, শিক্ষা ও জনকল্যাণমলক এবং বিচার সংক্রান্ত কাজ করে থাকে। এছাড়া :

বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের এবং পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে;

অস্বাস্থ্যকর ও ভেজালযুক্ত খাদ্য বিক্রি নিয়ন্ত্রণ করে;

শহরের পরিবেশ রক্ষার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে;

সুষ্ঠুভাবে ঘরবাড়ি নির্মাণের ব্যবস্থা করে;

সড়ক নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে;

রাস্তার দুধারে গাছ লাগানো, পার্ক ও উদ্যান প্রতিষ্ঠা ও উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ সংরক্ষণ করে।

তাছাড়া পৌরসভা বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, এতিম ও দুঃস্থদের জন্য এতিমখানা পরিচালনা, লাইব্রেরি ও ক্লাব গঠন করে। ভিক্ষাবৃত্তি নিরোধ, খেলাধুলার ব্যবস্থা, মিলনায়তন নির্মাণ ও সংরক্ষণ, জন্ম–মৃত্যু ও বিবাহ–নিবন্ধন, মহামারী ও সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ ও বিশিষ্ট অতিথিদের অভ্যর্থনা প্রদানের ব্যবস্থা করে।

সিটি কর্পোরেশনের কাজ : সিটি কর্পোরেশন মহানগরগুলোতে পৌরসভার অনুরূপ কাজ করে থাকে।

উপজেলা পরিষদের কাজ : উপজেলা পরিষদের কাজ অনেকাংশে ইউনিয়ন পরিষদের কাজের মতো। এছাড়া উপজেলা পরিষদ পাঁচশালাসহ বিভিন্ন মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করে। সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও তার সমন্বয় সাধন করে। বিভিন্ন ইউনিয়নের মধ্যে সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে।

জেলা পরিষদের কাজ

জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনা করে। উপজেলা ও পৌরসভার সংরক্ষিত এলাকার বাইরে রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণ করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, আবাসিক হোস্টেল তৈরি, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, অনাথ আশ্রম নির্মাণ, গ্রন্থাগার তৈরি ও নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা করে।

কৃষিখামার স্থাপন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ এবং পানি সেচের ব্যবস্থা করে। জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ করে। জেলার যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : তোমার নিজ ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের কাজের বাস্তবায়ন পরিস্থিতি মূল্যায়ন কর। কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ বাস্তবায়ন হচ্ছে না চিহ্নিত করো এবং প্রয়োজনীয় উন্নয়নের সুপারিশ করো। দলগতভাবে এ কাজটি করা যেতে পারে।

কাজ–২ : তোমার এলাকার স্থানীয় সরকারের কাজ বাস্তবায়নে তুমি কীভাবে সহযোগিতা করতে পার?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. **বাংলাদেশের সংবিধান ২০১১ সাল পর্যন্ত কতবার সংশোধন হয়েছে?**

ক. ১১	গ. ১৫
খ. ১৩	ঘ. ১৮

২. **বাংলাদেশ একটি গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। কারণ—**

i. জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস
ii. রাষ্ট্রপ্রধান উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা প্রাপ্ত
iii. সরকার জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii	গ. ii ও iii
খ. i ও iii	ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

মিসেস তাসলিমা জাতীয় সংসদের একজন সদস্য। কিন্তু তিনি সংসদ নির্বাচনের সময় ৩০০ আসনের কোনোটিতেই প্রার্থী ছিলেন না। তিনি একজন নির্বাচিত সদস্য হিসেবে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে নারীর কোটা বৃদ্ধি বিল উত্থাপন করেন।

৩. **মিসেস তাসলিমা কাদের ভোটে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলেন ?**

ক. জনগণের	গ. সাংসদদের
খ. মন্ত্রী পরিষদের	ঘ. উপজেলা চেয়ারম্যানদের

৪. মিসেস তাসলিমাকে সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচনের কারণ হচ্ছে—

i. মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করা

ii. সংসদের সদস্য সংখ্যা বাড়ানো

iii. নারীর স্বার্থ সংরক্ষণ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii গ. ii ও iii

খ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মধুপুর গ্রামের মিহির দাস মহাধুমধামে পূজার আয়োজন করেন। এতে গ্রামের অনেকেই সহযোগিতা করেছেন। কিন্তু গ্রামের মানুষের মধ্যে স্বার্থসংঘাত লেগেই আছে দেখে কতিপয় যুবক একটি সামাজিক সংগঠন গড়ে তোলেন। তাদের লক্ষ্য ভাষা সংস্কৃতির উন্নয়ন ও পারস্পরিক স্বার্থ সংঘাত দূরীকরণের মাধ্যমে "উন্নত মধুপুর " প্রতিষ্ঠা।

ক. বাংলাদেশের সংবিধান কখন গৃহীত হয়?

খ. "জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস" — ব্যাখ্যা কর।

গ. মিহির দাসের কাজের মাধ্যমে যে রাষ্ট্রীয় মূলনীতির প্রকাশ ঘটেছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "মধুপুর গ্রামের সামাজিক সংগঠনটি রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য অর্জনে সহযোগিতা করছে" — মতামত দাও।

২. গোলাম রব্বানী ভবানীপুর উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দা। তিনি তার এলাকার জনগণের ভোটে একটি স্থানীয় সংস্থার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি এলাকাবাসীর বিশুদ্ধ পানির সমস্যা দূর করার জন্য তার এলাকায় ৫টি গভীর নলকূপ স্থাপন করেন, রাস্তা ঘাট সংস্কার ও নির্মাণ করেন, গ্রামের গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেন।

ক. বাংলাদেশে জেলা পরিষদের সংখ্যা কত?

খ. ধর্ম নিরপেক্ষতা বলতে কী বুঝায়?

গ. গোলাম রব্বানীর কাজগুলি সরকারের কোন ধরনের কাজ তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "সংস্থাটির চেয়ারম্যান হিসেবে উক্ত কাজগুলো ছাড়াও গোলাম রব্বানী আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন" — বিশ্লেষণ কর।

অধ্যায়–আট
বাংলাদেশের দুর্যোগ

বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলির একটি। আমরা জানি যে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা উষ্ণায়নের কারণে সারা পৃথিবীতেই আজ জলবায়ুর পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। জলবায়ুর এই পরিবর্তনের ফলে উষ্ণমন্ডলীয় দেশে শুষ্ক মৌসুমে ফসলের উৎপাদন হ্রাস পাবে। এছাড়া বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, বন্যা ও জলাবদ্ধতা; শুষ্ক মৌসুমে অনাবৃষ্টি ও অত্যধিক খরা, টর্নেডো, সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটবে। শীত মৌসুমে হঠাৎ শৈত্য ও উষ্ণ প্রবাহ, কুয়াশা, শিলাবৃষ্টি, ভূমিক্ষয় এবং উপকূল অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশে ইতোমধ্যেই জলবায়ু পরিবর্তনের এই প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে।

পাঠ–১ ও ২ : বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, কারণ ও প্রভাব

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ধারণা

পৃথিবীর বুকে উদ্ভিদ ও প্রাণীর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে পানি, বায়ু ও অন্যান্য উপাদানের সমন্বয়ে গড়ে উঠা প্রাণ-উপযোগী পরিবেশের কারণে। উষ্ণায়নের ফলে সেই পরিবেশই ভয়ানকভাবে বিপন্ন হচ্ছে। এখন জানা যাক, এই 'উষ্ণায়ন' ব্যাপারটি কী। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির মাধ্যমে পৃথিবীতে মানুষ একদিকে যেমন তার জীবনকে করেছে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় তেমনি করেছে পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত ও ভারসাম্যহীন। জনসংখ্যার বিস্ফোরণ, বৃক্ষনিধন ও ইঞ্জিনচালিত যানবাহনসহ বড় বড় শিল্প-কারখানার কারণে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। সৃষ্টি হচ্ছে নানাবিধ সমস্যার। সমস্যাগুলোর একটি হলো 'গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া'। এটি একটি জটিল সমস্যা। গ্রিনহাউস মূলত কতগুলো গ্যাসের সমন্বয়ে গঠিত একটি আচ্ছাদন। গ্রিনহাউস গ্যাসকে তাপ বৃদ্ধিকারক গ্যাসও বলে। এই গ্যাস পৃথিবীর চারপাশে বায়ুমন্ডলে চাদরের মতো আচ্ছাদন তৈরি করে।

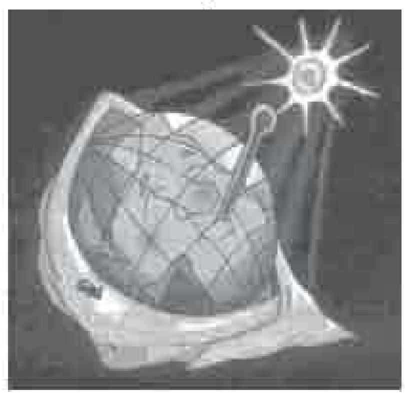

পৃথিবীকে ঘিরে গ্রিনহাউস গ্যাসের চাদর

পাশের চিত্রটি লক্ষ কর। এখানে গ্রিনহাউস গ্যাস পৃথিবীকে ঘিরে চাদরের মতো একটি আচ্ছাদন তৈরি করেছে। তার ফল কী হয়েছে? সূর্যের তাপ ওই চাদর শোষণ করে এবং তা পৃথিবীপৃষ্ঠে ছড়িয়ে দেয়। এভাবেই পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে। একেই বলা হয় বৈশ্বিক উষ্ণায়ন। এই উষ্ণায়নের ফলে বায়ুমন্ডল ও পৃথিবী ক্রমাগত উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। সমুদ্র পৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বাড়ছে।

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণ

গ্রিনহাউস গ্যাস ভূপৃষ্ঠের চারপাশে জমা হচ্ছে এবং তার ফলে তাপ

বায়ুর মূল উপাদান হলো নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন। এছাড়াও বায়ুতে নগণ্য পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইড আছে। আরও আছে জলীয় বাষ্প ও ওজন গ্যাস। বায়ুমণ্ডলের এই গৌণ গ্যাসগুলোকেই গ্রিনহাউস গ্যাস বলা হয়। প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট এসব গ্যাস ছাড়াও মনুষ্য সৃষ্ট সিএফসি (ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন) ও এইচসিএফসি (হাইড্রো ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন), হ্যালন ইত্যাদিও গ্রীনহাউস গ্যাস। এই গ্যাসগুলোর মধ্যে গত এক শতাব্দীতে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে শতকরা ২৫ ভাগ। একইভাবে নাইট্রাস অক্সাইডের পরিমাণও শতকরা ১৯ ভাগ এবং মিথেনের পরিমাণ ১০০ ভাগ বেড়েছে। যা বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রধান কারণ। এছাড়া অন্যান্য কারণও রয়েছে।

আমরা যেসব দ্রব্য ব্যবহার করি, যেমন রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার, প্লাস্টিক, ফোম, এরোসল প্রভৃতির ফলেও বায়ুমণ্ডলে উৎপন্ন হচ্ছে এক ধরনের গ্রিনহাউস গ্যাস (এইচসিএফসি)। এই গ্যাসের কারণে বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বায়ুমণ্ডলের অনেকগুলো স্তর আছে। তার মধ্যে ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী স্তর ট্রপোস্ফিয়ার সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যার গড় উচ্চতা ১২ কি.মি.। এর পরে হলো ওজোন স্তর, যা ২০ কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত। ওজোন স্তর সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে পৃথিবীর জীবজগতকে রক্ষা করে। ওজোন স্তর ক্ষয়ের কারণে ভূপৃষ্ঠে অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাব শতকরা পাঁচ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটাও বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়ার কারণ।

কালো ধোঁয়া

বিশ্বের উন্নত দেশগুলো অধিক হারে জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহার করে পরিবেশ নষ্ট করছে। তাছাড়া এসব দেশ পারমাণবিক চুল্লি ব্যবহার করে, যা থেকে প্রচুর বর্জ্য সৃষ্টি হয়। এই বর্জ্যও গ্রিনহাউস গ্যাস বৃদ্ধি করছে। শিল্প-কারখানার বর্জ্য ও কালো ধোঁয়া থেকেও প্রচুর পরিমাণে পারদ, সিসা ও আর্সেনিক নির্গত হয়। এটাও বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণ।

সমুদ্রে বর্জ্য ফেলা ও কালো ধোঁয়া উদগীরণ

বন উজাড় হওয়া

মহাসমুদ্র হলো পৃথিবীর ফুসফুস। বিশ্বের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে মহাসমুদ্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু সমুদ্রে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নিক্ষেপ করার ফলে তা দূষিত হচ্ছে এবং এ দূষিত বাষ্প বাতাসে মিশ্রিত হয়ে ওজোন স্তরের ক্ষতি করছে। বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র একটি দেশেও এক সময় বহু নদী-নালা, খাল-বিল ও হাওড়-বাওর ছিল যা তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখত। এখন এসব

নদী-খাল-বিল শুকিয়ে গিয়েছে কিংবা ভরাট করে ফেলা হয়েছে। অনেক নদী ও খাল বর্জ্য ফেলার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এভাবে অনেক অনুন্নত দেশেই এসব নদ-নদীর অপব্যবহার হওয়ায় বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পরিবেশ দূষণের পিছনে যে কারণটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো বন উজাড়করণ। আমরা জানি, সবুজ উদ্ভিদ বাতাস থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং আমাদের জন্য অক্সিজেন ত্যাগ করে। কিন্তু ব্যাপকহারে বৃক্ষ নিধন বা বন উজাড়করণের ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেছে। ফলে বায়ুমণ্ডলে ওজোন স্তর ক্ষয়কারী সিএফসি গ্যাস অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি

বর্তমান বিশ্বে ব্যাপকহারে নগর গড়ে উঠছে। মানুষ কাজের খোঁজে শহরে ছুটছে। ফলে শহরে বাড়ছে জনসংখ্যার চাপ; বাড়ছে বিভিন্ন প্রকার যানবাহনের সংখ্যা। এসব যানবাহনের নির্গত কালোধোঁয়া হচ্ছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড। যা বায়ুমণ্ডলের-ওজোন স্তরকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তাছাড়া শিল্প-কারখানার কালোধোঁয়াও নগরের বায়ুতে কার্বনের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এও বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির একটা কারণ।

কৃষিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার

কৃষিতে যান্ত্রিক সেচ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। এসবের ফলেও বায়ুমণ্ডলের ওজোনস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যার প্রভাবে বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়ছে।

আমরা সপ্তম শ্রেণিতে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে জেনেছি। জলবায়ু পরিবর্তনের একটি প্রধান কারণ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন। এর ফলে পৃথিবীর সর্বত্র আজ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশও তা থেকে মুক্ত নয়। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবে বাংলাদেশে পরিবেশ ও জীবনযাত্রায় যেসব ক্ষতি হতে পারে তা হলো :

সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার ফলে উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহে সমুদ্রের পানি ঢুকে পড়বে। আর সমুদ্রের লবণাক্ত পানির প্রভাবে গাছপালা, মৎস্যখামার ও শস্যক্ষেত্রের ক্ষতি হবে। ইতোমধ্যেই এর প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহে ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের ক্ষতি হচ্ছে। সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। উপকূলীয় এলাকার কৃষি জমিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। জমির উর্বরাশক্তি কমে গেছে। এ কারণে এসব অঞ্চলে কৃষি উৎপাদনও কমে গেছে। অনেক রকম মিঠা পানির মাছ হারিয়ে যাচ্ছে। ধ্বংস হচ্ছে গাছপালা। এর প্রভাব পড়ছে মানুষের জীবন-জীবিকার উপর। জীবিকার টানে মানুষ শহরমুখী হচ্ছে। শহরের উপর চাপ বাড়ছে।

সমুদ্রের পানি বৃদ্ধির কারণে স্বাভাবিকের তুলনায় উঁচু জোয়ারের সৃষ্টি হয়। যা জলোচ্ছ্বাসের আকার ধারণ করে। আবার সমুদ্রে নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ার কারণে সাইক্লোনের তীব্রতা বেড়ে যায়। আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ 'আইলা' ও 'সিডর' এর নাম শুনেছি। এ দুটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আমাদের দেশের উপকূলবর্তী এলাকায় প্রাণহানি ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তাছাড়া বিস্তীর্ণ জনপদে লবণাক্ত পানি ঢুকে ফসলাদি, বাড়ি-ঘর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। খাবার পানির তীব্র অভাব দেখা দিয়েছে। সুন্দরবনের প্রায় এক-চতুর্থাংশ বন নষ্ট হয়েছে। জীববৈচিত্র্য ও মৎস সম্পদের ক্ষতি হয়েছে।

উষ্ণায়নের কারণে পৃথিবীপৃষ্ঠে তাপমাত্রা বৃদ্ধির এবং সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি সরাসরি পৃথিবীতে আসার ফলে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর বিভিন্ন প্রকারের মারাত্মক রোগ সৃষ্টি হচ্ছে। ক্যান্সার, চর্মরোগসহ নানা ধরনের নতুন নতুন রোগের আবির্ভাব ঘটছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। যেমন বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ইতোমধ্যে মরুকরণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

উষ্ণায়নের ফলে সৃষ্ট বন্যা, খরা, লবণাক্ততা প্রভৃতির কারণে গবাদি পশুর খাদ্যের অভাব হবে; বাড়বে বিভিন্ন ধরনের রোগ। এসব ক্ষতিকর প্রভাব বিবেচনা করে আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ মোকাবেলায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ– ১ : বৈশ্বিক উষ্ণায়ন কী–কী কারণে ঘটে, উল্লেখ কর।

কাজ– ২ : বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবে মানুষ, পরিবেশ ও জীবজন্তুর কী–কী ক্ষতি হচ্ছে এবং হতে পারে? উল্লেখ কর।

পাঠ– ৩ : দুর্যোগের ধারণা ও ধরন

দুর্যোগ দুই ধরনের। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মানবসৃষ্ট দুর্যোগ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ আকস্মিকভাবে ঘটে এবং তার উপর সাধারণত মানুষের হাত থাকে না। কিন্তু মানবসৃষ্ট দুর্যোগ অনেকটা মানুষের কর্মকাণ্ডের ফল এবং মানুষ সচেতন ও সতর্ক থাকলে তা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। মানুষের অপকর্ম বা দূরদৃষ্টির অভাবে যে দুর্যোগ সৃষ্টি হয় এবং যা মানুষের প্রাণহানি ঘটানোর পাশাপাশি তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে, পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করে এবং সমাজকে অস্থিতিশীল করে তোলে, তাকে মানবসৃষ্ট দুর্যোগ বলে। যেমন : যুদ্ধ-বিগ্রহ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বনভূমি বিনাশ, নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি ও মরুকরণ, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি। অন্যদিকে প্রাকৃতিক কোনো দুর্ঘটনা বা বিপর্যয় যখন কোনো জনপদের স্বাভাবিক জীবনাযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে তোলে তখন তাকে আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলি। যেমন বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, ভূমিকম্প, খরা, নদীভাঙ্গান, সুনামি, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মূলত একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ুগত প্রভাব তথা সামগ্রিক প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে ঘটে থাকে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, ভূমির গঠন,

নদী-নালা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টির সহায়ক। এ কারণে এদেশে প্রায় প্রতিবছরই ছোট-বড় বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও টর্নেডোর মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ- ১ : দুর্যোগ কাকে বলে?

কাজ- ২ : প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের ৫টি করে উদাহরণ দাও।

পাঠ- ৪ ও ৫ : বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ

সপ্তম শ্রেণিতে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট কয়েকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা জেনেছি। এ পাঠে আমরা আরও কয়েকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে জানব।

সুনামি

সুনামি

সুনামি একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের নাম। এটি মূলত জাপানি শব্দ। যার অর্থ হলো 'সমুদ্রতীরের ঢেউ'। সমুদ্রের তলদেশে প্রচণ্ড ভূমিকম্প বা অগ্ন্যুৎপাতের ফলে, কিংবা অন্য কোনো কারণে, ভূ-আলোড়নের সৃষ্টি হলে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে প্রবল ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। এই প্রবল ঢেউ উপকূলভাগে এসে তীব্র বেগে আছড়ে পড়ে। এই সামুদ্রিক ঢেউয়ের গতিবেগ ঘণ্টায় ৮০০ থেকে ১৩০০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। সুনামির কারণে সমুদ্রের পানি জলোচ্ছ্বাসের আকারে ভয়ঙ্কর গতিতে উপকূলের ১০ কিলোমিটারের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে। এর ফলে স্বল্প সময়ে মধ্যেই উপকূলের ঘর-বাড়ি, দালান, রেলপথ, রাস্তাঘাট, বৈদ্যুতিক যোগাযোগ-ব্যবস্থা, বাণিজ্য কেন্দ্র প্রভৃতি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

২০১১ সালে জাপানের উত্তর-পূর্ব এলাকায় ভয়াবহ সুনামি সংঘটিত হয়। ৮.৯ মাত্রার ভূমিকম্পে এই সুনামি সৃষ্টি হয়। জাপানের রাজধানী টোকিও শহরের প্রায় ৪০০ কিলোমিটার উত্তরপূর্বে এই সুনামি আঘাত হেনেছিল। এর ফলে জাপানের পাঁচটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব বিদ্যুৎকেন্দ্রের পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তা বাতাস ও পানির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। যা মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকির সৃষ্টি করে। সুনামির সময় হাজার হাজার ট্রেনযাত্রী নিখোঁজ হয়। জাহাজ সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যায়।

ভূমিধস

পাহাড়ের মাটি ধসে পড়াকেই ভূমিধস বলা হয়। যেসব পাহাড় বেলে পাথর বা শেল কাদা দিয়ে গঠিত, ভারি বৃষ্টিপাত হলে সেসব পাহাড়ে ভূমিধস ঘটতে পারে। সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী ও ভারি

বৃষ্টিপাতের কারণেই ভূমিধস ঘটে থাকে। তাছাড়া মানুষ ব্যাপকহারে গাছপালা ও পাহাড় কেটে ভূমিধসের কারণ ঘটায়। ভূমিধসের ফলে যারা পাহাড়ের পাদদেশে বসবাস করে তাদের ঘরবাড়ি মাটির নিচে চাপা পড়তে পারে। আমাদের দেশে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান, সিলেট, নেত্রকোণা প্রভৃতি জেলায় প্রায়ই ভূমিধস হয়ে মানুষের প্রাণহানি ও বাড়িঘর নষ্ট হয়।

ভূমিধস

বন উজাড়

পাছপালা বা বনভূমি পরিবেশ ও জলবায়ু অনুকূল রাখতে সাহায্য করে। পরিবেশের ভারসাম্যের জন্য একটি দেশের মোট আয়তনের ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু আজ মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে বনভূমি ধ্বংস করছে। বন কেটে বাড়িঘর নির্মাণ করা হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে বনভূমির পরিমাণ শতকরা ১৬ ভাগ যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং জলবায়ুর উপর তার বিরূপ প্রভাব পড়ছে। এতে বৃষ্টিপাত কমে খরা পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে, মরুকরণের ঝুঁকি বাড়ছে।

বনভূমি ধ্বংস

জলাভূমি ভরাট

নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর-দিঘি প্রভৃতি জলাভূমি বৃষ্টি ও বন্যার পানি ধারণ করে চারপাশের মাটিকে সরস রাখে। আবার রোদের তাপে জলাভূমির পানি বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যায় ও বৃষ্টিপাতে সহায়তা করে। তাছাড়া জলাভূমি হলো মাছের আবাসস্থল। কিন্তু আমাদের দেশে বর্তমানে জলাভূমিগুলো ভরাট করে বসতবাড়ি ও কলকারখানা নির্মাণ করা হচ্ছে। ফলে আগে আমরা এসব জলাভূমি থেকে যে মাছ পেতাম তা আর পাওয়া যাচ্ছে না। তাপ নিয়ন্ত্রণসহ নানাভাবে এই জলাভূমিগুলো প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে। জলাভূমিগুলো ভরাট হওয়ার ফলে আমাদের দেশে বর্তমানে একটু বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতা সৃষ্টি ও লোকালয় প্লাবিত হচ্ছে।

অগ্নিকাণ্ড

অগ্নিকাণ্ড যেমন প্রাকৃতিক কারণে তেমনি মানুষের অসাবধানতার ফলে বা দুর্ঘটনাজনিত কারণেও ঘটতে পারে। প্রচণ্ড দাবদাহের কারণে কোনো কোনো দেশে বনাঞ্চলে অগ্নিকাণ্ড ঘটতে দেখা যায়। একে দাবানল বলে। এর ফলেও বৃক্ষসম্পদ নষ্ট হয়। নষ্ট হয় জীববৈচিত্র্য।

অগ্নিকাণ্ড

আমাদের দেশে দাবানলের ঘটনা সাধারণত ঘটে না। কাজেই আমাদের দেশে অগ্নিকাণ্ডকে ঠিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলা যাবে না। এখানে দুর্ঘটনা বা মানুষের অসাবধানতাই অগ্নিকাণ্ডের কারণ। দুর্ঘটনাজনিত অগ্নিকাণ্ড সাধারণত শিল্পকারখানা, তেলশোধনাগার, গার্মেন্টস শিল্প, পাটকল, রাসায়নিক গুদাম বা কারখানা এমনকি বসতবাড়ি, দোকানপাট, অফিস ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ঘটতে দেখা যায়। সম্প্রতি ঢাকার নিমতলিতে রাসায়নিক গুদাম থেকে সৃষ্ট অগ্নিকাণ্ডে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটেছে, অনেকে পঙ্গু হয়ে পড়েছে, অনেক পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। এছাড়াও আমাদের দেশে গ্রাম ও শহরাঞ্চলে জলন্ত চুলা, কুপি, মশার কয়েল, সিগারেটের আগুন, হারিকেন প্রভৃতি থেকেও অসাবধানতাবশত অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ– ১ : বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগের নাম লেখ।

কাজ– ২ : প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের উৎস ও প্রভাব উল্লেখ কর।

পাঠ– ৬, ৭ ও ৮ : দুর্যোগ মোকাবেলায় করণীয়

আমরা আগেই জেনেছি, ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল। এদেশের মানুষ যুগ যুগ ধরে দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে আছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোধ করা যায় না, তবে উপযুক্ত পূর্বপ্রস্তুতি এবং কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে এসব দুর্যোগে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব।

বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় করণীয়

দুর্যোগপূর্ব করণীয়

১. যথা সম্ভব উঁচু জায়গায় বসত ভিটা, গোয়ালঘর ও হাঁস–মুরগির ঘর তৈরি করতে হবে।
২. নদী তীরবর্তী এলাকায় বেড়ি বাঁধের ভেতরে এবং সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে কেন্টনির ভেতরে বসতভিটা তৈরি করতে হবে।

বাড়ির চারপাশে ঢোলকলমি ও কলাগাছ লাগানো হয়েছে

৩. বাড়ির চারপাশে বাঁশঝাড়, কলাগাছ, ঢোলকলমি, ধৈঞ্চা ইত্যাদি গাছ লাগাতে হবে। এসব গাছ বন্যার স্রোত অনেকটা প্রতিরোধ করতে পারে।
৪. ঘরের ভেতরে উঁচু মাচা বা পাটাতন তৈরি করে তার উপর খাদ্যশস্য, বীজ ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে। যাতে ঘরে পানি ঢুকলেও এগুলি নষ্ট না হয়।
৫. প্রতিটি পরিবারে দা, খুন্তি, কুড়াল, কোদাল, ঝুড়ি, নাইলনের দড়ি, বাঁশের চাটাই, টিনের তাজা টুকরা, আলগা চুলা, রেডিও, টর্চ লাইট ও ব্যাটারি জোগাড় করে রাখতে হবে।

দুর্যোগপূর্ব সতর্কীকরণ

৬. পুকুরের পাড় উঁচু করতে হবে এবং টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিন যতটা সম্ভব উঁচু স্থানে বসাতে হবে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত পাইপ লাগিয়ে টিউবওয়েলের মুখ উঁচু করতে হবে।
৭. শুকনা খাবার যেমন চিড়া, মুড়ি, খৈ, গুড় এবং প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র বিশেষ করে খাবার স্যালাইন ঘরে মওজুদ রাখতে হবে। দুর্যোগকালীন সময়ের জন্য কিছু পরিমাপ গোখাদ্যও সংরক্ষণ করতে হবে।
৮. পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে সাঁতার শেখার ব্যাপারে উৎসাহী করতে হবে।
৯. বন্যা বা ঝড়–জলোচ্ছ্বাসের মৌসুমের আগে বসতভিটা মেরামত বিশেষ করে–খুঁটি–মজবুত করতে হবে।
১০. নিকটবর্তী আশ্রয়কেন্দ্রের খোঁজ রাখতে হবে।
১১. সঞ্চয়ের মনোভাব গড়ে তুলতে হবে।
১২. সতর্ক–সংকেত ও তার ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানতে হবে।
১৩. এলাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে।

দুর্যোগ মোকাবেলায় সামাজিক কমিটি

১৪. এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ, রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট ইত্যাদি মেরামতের জন্য সামাজিকভাবে উদ্যোগী হতে হবে।

১৫. এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, সামাজিক কমিটি, স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়মিত সভা করে দুর্যোগ প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে এলাকাবাসীকে সচেতন করতে হবে।

দুর্যোগকালীন করণীয়

১. বন্যা শুরু হলে নিয়মিতভাবে পানি বাড়া বা কমা পর্যবেক্ষণ কিংবা এ-সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখতে হবে। ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাসের প্রতি মনোযোগী হতে হবে।

২. বন্যার সময় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পলিথিন বা অন্য পানিরোধক প্যাকেটে মুড়ে ঘরের চালের নিচে পাটাতনে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস পাবার সঙ্গে সঙ্গে খাবার পানি কলসিতে ভরে ভালো করে ঢেকে দিয়ে পলিথিন দিয়ে বেঁধে এবং সেই সাথে কিছু শুকনো খাবার যেমন চিড়া, মুড়ি, গুড় একটি পাত্রে ভরে ভালো করে পলিথিন বা প্লাস্টিক ব্যাগে মুড়ে মাটির নিচে পুঁতে রাখতে হবে।

দুর্যোগে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়া

৩. গবাদি পশু ও হাঁস–মুরগিগুলোকে উঁচু স্থানে সরিয়ে রাখতে হবে।

৪. বন্যায় বাড়িঘর ডুবে গেলে নিকটস্থ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিতে হবে। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ক্ষেত্রে ১, ২, ৩ ও ৪ নং সতর্ক-সংকেত পর্যন্ত আশ্রয়কেন্দ্রে যাবার প্রয়োজন নেই। তবে ৫ নং বিপদসংকেত শোনার পর শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ও মেয়েদের আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিতে হবে এবং মহাবিপদ সংকেত শোনার পর সবাইকে অবশ্যই আশ্রয়কেন্দ্রে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে। আশ্রয়কেন্দ্র না থাকলে কাছাকাছি পাকা, উঁচু বা বহুতল বাড়ি, স্কুল-কলেজ বা অন্য প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় নিতে হবে।

৫. দুর্যোগে বিশুদ্ধ বা নিরাপদ পানি পান করতে হবে। যে টিউবওয়েলের মুখ পানিতে ডোবেনি এমন টিউবওয়েলের পানি পানের জন্য নিরাপদ। প্রয়োজনে পানি ভালোভাবে ফুটিয়ে কিংবা পানি বিশুদ্ধিকরণ ট্যাবলেট বা ফিটকারি ব্যবহার করে পান করতে হবে।

দুর্যোগের সময়ে নিরাপদ পানি পান

৬. যে কোনো দুর্যোগের সময় ছোট শিশুদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। অসুস্থ, প্রতিবন্ধী, গর্ভবতী নারী ও বৃদ্ধদের প্রতি অধিক যত্নশীল হতে হবে।

৭. বন্যাকালীন সময়ে যাতায়াতের জন্য নৌকা না থাকলে কলাগাছের ভেলা তৈরি করে নিতে হবে।

৮. পরিবারের সকল সদস্যকে বিভিন্ন সংক্রামক রোগের টিকা নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
৯. আশ্রয়কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সামাজিকভাবে উদ্যোগী হতে হবে।
১০. আশ্রয়কেন্দ্রে ল্যাট্রিন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা যাতে যথাযথ থাকে সে ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে।
১১. নিজের সুযোগ-সুবিধাকে বড় করে না দেখে, সবার প্রতি সহানুভূতিশীল ও মানবিক আচরণ করতে হবে।

দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে করণীয়

১. বন্যার পানি নেমে গেলে বা ঝড় পুরোপুরি থেমে গেলে আশ্রয়কেন্দ্র ছেড়ে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যেতে হবে।
২. ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে ঝড় থেমে যাবার পর পরই আশ্রয়কেন্দ্র ছেড়ে যেতে নেই। কারণ একবার ঝড় থেমে যাবার কিছুক্ষণ পর আবার উল্টো দিক থেকে তীব্র বেগে ঝড় প্রবাহিত হয়ে আঘাত হানতে পারে। দেখা গেছে উল্টো দিকের ঝড়ে জলোচ্ছ্বাসের পানি তীরের সবকিছু সমুদ্রের বুকে টেনে নেয়।
৩. ঘরবাড়ি পরিষ্কার ও মেরামত করে বাসযোগ্য করে তুলতে হবে, এজন্য প্রয়োজনে ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করতে হবে।
৪. দুর্যোগে কেউ আহত হলে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হবে। আঘাত গুরুতর হলে দ্রুত তাকে কাছাকাছি হাসপাতালে নিতে হবে এবং সেখানে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

স্বেচ্ছাসেবকদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান

৫. কোনো ব্যক্তি মারা গেলে, লাশ উদ্ধার করে যত দ্রুত সম্ভব তা সমাহিত করার ব্যবস্থা করতে হবে। মরা পশুপাখিও মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।
৬. বাইরে থেকে ত্রাণ ও চিকিৎসক দল এলে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তরা যাতে সাহায্য পায় সে ব্যাপারে সহযোগিতা করতে হবে।
৭. দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলায় সমাজের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

নদীভাঙন মোকাবেলার প্রস্তুতি

কোথাও নদীভাঙনের আশঙ্কা দেখা দিলে প্রথমেই জীবন ও সম্পদ রক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে। কোথায় আশ্রয় নেয়া যায় তা আগে থেকেই ঠিক করতে হবে। তাছাড়া সময় থাকতে শিশু, বৃদ্ধ, গর্ভবতী নারী, প্রসূতি ও প্রতিবন্ধীদের নিরাপদ আশ্রয়ে বা আত্মীয়ের

নদীভাঙন

বাড়ি পাঠাতে হবে। বাড়ির হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রাখতে হবে। ঘরের মূল্যবান সামগ্রী ও দলিলপত্র আগে থেকে নিরাপদ স্থানে সরাতে হবে। নদীভাঙনের আশঙ্কা দেখা দিলে প্রয়োজনে বাড়ির গাছপালা, শাকসবজি বিক্রি করে দিতে হবে। আগে থেকেই গোয়ালঘর ও রান্নাঘর নিরাপদ স্থানে সরাতে হবে। ভাঙন কাছাকাছি আসার আগেই থাকার ঘর নিরাপদ স্থানে সরাতে হবে।

নদীভাঙনের আগেও আমরা কতগুলো পদক্ষেপ নিতে পারি। যা আমাদেরকে নিরাপদ রাখবে। নদীর পাড়ে কোনো কিছু নির্মাণ করতে হলেও তা এমনভাবে করতে হবে যেন সেটা সহজেই সরিয়ে নেয়া যায়। তাছাড়া নদীর পাড়ে এমন ধরনের গাছ লাগাতে হবে যেগুলোর শিকড় মাটির খুব গভীরে চলে যায়। নদীতে চলাচলকারী বিভিন্ন জলযানের গতিসীমা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। যাতে এসব যান নদীতে প্রবল ঢেউ সৃষ্টি না করে। নদীভাঙনের উপক্রম দেখলে আমাদের সব সময় নদীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

নদীভাঙনের পর নিরাপদ আশ্রয়ে গমন

নদীভাঙনের পরে আমাদের ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াতে হবে। তাদের বাড়িঘর নির্মাণে সহায়তা করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধের যেসব স্থানে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো মেরামত করতে হবে।

খরা মোকাবেলায় প্রস্তুতি

আমাদের দেশের উত্তরাঞ্চলে অনেক সময় খরা হতে দেখা যায়। খরা মোকাবেলায় আমরা কিছু পদক্ষেপ নিতে পারি। যেমন খরার আগে এসব অঞ্চলে পুকুর ও খাল খনন করতে হবে। তাছাড়া যেখানে যেখানে সম্ভব বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে হবে। দুর্যোগকালীন সময়ের জন্য শুকনো খাবার ও নগদ অর্থ মজুদ রাখতে হবে। একইভাবে গবাদি পশুর জন্যও খাবার মজুদ করে রাখা প্রয়োজন। এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন করতে হবে। যেসব ফসল চাষে খুব বেশি পানির দরকার হয় না খরাপ্রবণ এলাকায় সেসব ফসল আবাদ করতে হবে।

খরা

খরার ফলে বিপর্যস্ত পরিবারগুলোর জন্য বিকল্প আয়ের উৎস খুঁজতে হবে। এ সময়ে পানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে হবে এবং বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ এড়াতে গবাদি পশুকে পুকুর থেকে দূরে রাখতে হবে।

খরা কেটে যাবার পর কৃষিকাজে রাসায়নিক সারের বদলে জৈবসার ব্যবহার করতে হবে। আগাছা ও জঞ্জাল পরিষ্কার করে জমিতে পানির অপচয় কমাতে হবে। এ সময়ে গভীর করে জমি চাষ করতে হবে। মাটির গভীরে শিকড় প্রবেশ করে এমন ফসল আবাদ করতে এবং বেশি করে গাছ লাগাতে হবে।

ভূমিকম্প মোকাবেলায় করণীয়

বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চল বেশি রকম ভূমিকম্প ঝুঁকির মধ্যে আছে। এগুলোকে বলা হয় ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা। যেমন দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, টাংগাইল, ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার। দেশের অন্যান্য এলাকাগুলোতেও যে ভূমিকম্পের আশঙ্কা নেই তা নয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে ভূমিকম্প সম্পর্কে আগে থেকে কোনো পূর্বাভাস পাওয়া যায় না। তারপরও ভূমিকম্প মোকাবেলা অর্থাৎ ভূমিকম্পে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি কমাতে আমরা যেসব পদক্ষেপ নিতে পারি সেগুলো হলো :

ভূমিকম্পের আগে প্রস্তুতি

বাড়িতে প্রধান দরজা ছাড়াও জরুরি অবস্থায় বের হওয়ার জন্য একটি বিশেষ দরজা থাকা প্রয়োজন। এছাড়াও বাড়িতে প্রাথমিক চিকিৎসা সামগ্রী, হেলমেট, টর্চ প্রভৃতি মজুত রাখতে হবে। ভূমিকম্পের সময় আশ্রয় নেওয়া যায় বাড়িতে এমন একটি মজবুত টেবিল রাখতে হবে। ঘরের ভারি আসবাবপত্র মেঝের উপরে রাখতে হবে। ব্যবহারের পর বৈদ্যুতিক বাতি ও গ্যাস সংযোগ বন্ধ করে রাখতে হবে।

ভূমিকম্প চলাকালীন কোনো শক্ত টেবিল কিংবা শক্ত কাঠের আসবাবপত্রের নিচে অবস্থান নিতে হবে। আতঙ্কিত না হয়ে ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘরের মধ্যে থাকতে হবে। অবিলম্বে সকল বৈদ্যুতিক সুইচ ও গ্যাসের সংযোগ বন্ধ করে দিতে হবে। তবে বাড়ির আশেপাশে যদি যথেষ্ট পরিমাণ খোলা জায়গা থাকে তবে সম্ভব হলে দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে উক্ত খোলা জায়গায় চলে যেতে হবে। ট্রেন, বাস বা গাড়িতে থাকলে চালককে তা থামাতে বলতে হবে। ভূমিকম্পের সময় লিফট ব্যবহার করা যাবে না।

ভূমিকম্প হওয়ার পরে আহত লোকজনকে দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সাধ্যমতো উদ্ধার কর্মকাণ্ডে সহায়তা করতে হবে। এ ব্যাপারে ফায়ার ব্রিগেড অর্থাৎ অগ্নিনির্বাপক দল ও অ্যাম্বুলেন্সের সাহায্য নিতে হবে। দুর্গত মানুষের জন্য অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র, খাবার ও পানির ব্যবস্থা করতে হবে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ– ১ : বন্যার সময় কীভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানো যেতে পারে বলে তুমি মনে কর।

কাজ– ২ : বন্যার পর তোমার এলাকায় দুর্গত মানুষের সাহায্যে তুমি কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পার।

কাজ– ৩ : হঠাৎ ভূমিকম্প অনুভব করলে তুমি আত্মরক্ষার জন্য কী কী করবে?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. **কোনো দেশের মোট আয়তনের শতকরা কত ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন?**

ক. ১৬ গ. ২০
খ. ১৯ ঘ. ২৫

২. **বনভূমির বৃক্ষ নিধনের ফলে—**

i. বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে
ii. পৃথিবী মরুময় হয়ে যাচ্ছে
iii. সুনামির সৃষ্টি হচ্ছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii গ. i ও iii
খ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

অনিন্দ্য টেলিভিশনে দেখতে পেল একটি দেশের পার্শ্ববর্তী সমুদ্র তলদেশে অগ্ন্যুৎপাত ঘটায় দেশটির জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

৩. **উক্ত ঘটনার ফলে কোন দুর্যোগটি ঘটতে পারে?**

ক. সুনামি গ. সাইক্লোন
খ. খরা ঘ. ভূমিধস

৪. **উক্ত ঘটনার ফলে সৃষ্ট দুর্যোগটি বেশি ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে—**

i. পাহাড়ী এলাকায়
ii. সমুদ্রতীরবর্তী এলাকায়
iii. ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii গ. ii ও iii
খ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

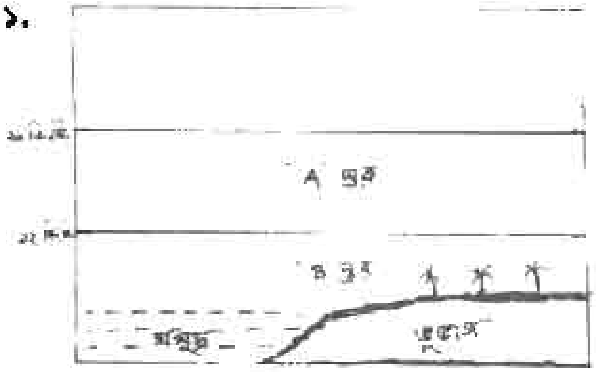

চিত্র – ১

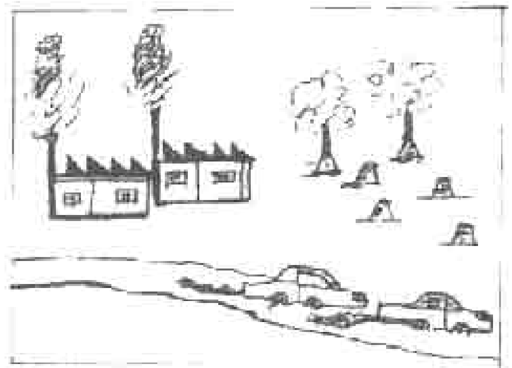

চিত্র – ২

ক. দুর্যোগ কয় ধরনের?
খ. বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রধান কারণ কী? ব্যাখ্যা কর।
গ. চিত্র–১ এর 'A' স্তরটির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।
ঘ. চিত্র–২ এর কর্মকাণ্ডগুলোর প্রভাব চিত্র–১ এর A ও B স্তর দুটির ক্ষতির মূল কারণ বিশ্লেষণ কর।

২. সজীব ও নিয়াজ কক্সবাজারের মহেশখালি দ্বীপে বসবাস করে। ঝড়, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া তারা নিয়মিত দেখে আসছে। একদিন রেডিওতে ৫নং বিপদ সংকেত শুনতে পেয়ে সজীব নিকটস্থ আশ্রয় কেন্দ্রে চলে যায়। কিন্তু নিয়াজ ব্যাপারটি আমল না দিয়ে বাসায় থেকে যায়। এ দিকে ঝড় থামার পর পরই সজীব আশ্রয় কেন্দ্র ত্যাগ করতে চাইলেও অন্যরা তাকে যাওয়া থেকে বিরত করল।

ক. মহাসমুদ্রকে পৃথিবীর কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?
খ. সুনামি বলতে কী বুঝায়?
গ. সজীবকে আশ্রয় কেন্দ্র ত্যাগে বাঁধা দেওয়া হয় কেন? কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উক্ত পরিস্থিতিতে নিয়াজের কর্মকাণ্ডটি যুক্তিযুক্ত কিনা ব্যাখ্যা কর।

অধ্যায়–নয়
বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও উন্নয়ন

জনসংখ্যা ও উন্নয়ন এই দুটি ধারণা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। একটি দেশের জনসংখ্যার উপর সে দেশের উন্নয়ন অনেকখানি নির্ভর করে। উন্নত দেশের সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশের জনসংখ্যা ও সে সব দেশের জনগণের মাথাপিছু আয়ের তুলনা করলেই আমরা সেটি বুঝতে পারব। উদাহরণ হিসেবে আমেরিকা ও বাংলাদেশ এই দুটি দেশের কথাই ধরা যাক। আমেরিকায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৩২ জন লোক বাস করে এবং তাদের মাথাপিছু আয় ৪৬,৯৭০ ডলার। অন্যদিকে বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৯৯৩ জন লোক বাস করে এবং তাদের মাথাপিছু আয় মাত্র ৮১৮ ডলার। একটি দেশ ভবিষ্যতে কতটা উন্নতি করবে তা দেশটির অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও তার জনসংখ্যানীতির কার্যকর প্রয়োগের উপর নির্ভর করে। বাংলাদেশের মতো একটি জনবহুল এবং উন্নয়নশীল দেশের বেলায় কথাটা আরও বেশি সত্যি। এই অধ্যায়ে আমরা জনসংখ্যা বিষয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন কর্মসূচি এবং জনসংখ্যাকে সম্পদে রূপান্তরের কৌশল সম্পর্কে জানতে পারব।

পাঠ– ১ ও ২ : বাংলাদেশের জনসংখ্যানীতি

সাধারণভাবে দেশের জনসংখ্যা বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকেই বলা হয় দেশটির জনসংখ্যানীতি। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই নীতি প্রণয়ন করা হয়। এ নীতির লক্ষ্য হলো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে দেশের নাগরিকদের জীবনমানের উন্নতি এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। বাংলাদেশের জনসংখ্যানীতির মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যগুলো হলো :

১। দেশের সব মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা পৌঁছে দেওয়া। বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য পরিবার পরিকল্পনার সুযোগ ও অত্যাবশ্যক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।

২। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা জোরদার করা।

৩। শিশু ও নারীর অপুষ্টির হার কমিয়ে আনা।

৪। ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা। থানা ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সার্বক্ষণিক ডাক্তার, নার্স ও প্রয়োজনীয় ঔষধের সরবরাহ নিশ্চিত করা। প্রতিটি গ্রামে প্রসূতিদের নিরাপদ সন্তান জন্মদানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৫। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে সর্বত্র ও সকলের কাছে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া।

৬। দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের জন্য প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা।

৭। দেশের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।

জনসংখ্যা সম্পর্কে বাংলাদেশের শ্লোগান হচ্ছে 'ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানই যথেষ্ট'। প্রতিবছর ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে বাংলাদেশে 'জাতীয় জনসংখ্যা দিবস' পালন করা হয়।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি উদ্যোগ :

জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার কমিয়ে আনার জন্য সরকার নিম্নলিখিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে :

ক. নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সরকার ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর ও ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

খ. সরকার নারীশিক্ষার প্রসারের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যেমন প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ এবং ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

গ. সরকার নাগরিকদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। একই সঙ্গে পরিবার ছোট রাখার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম চালু রয়েছে।

ঘ. কাজি অফিসে বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

ঙ. হাঁস-মুরগির খামার ও মাছ চাষের মতো আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণের উপর সরকার গুরুত্ব আরোপ করেছে । তাছাড়া পোশাকশিল্প, কারুশিল্প ও অন্যান্য হস্ত ও কুটিরশিল্পেও নারীরা বর্তমানে বেশিসংখ্যায় অংশ নিচ্ছে। এগুলো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। শিশুমৃত্যু হ্রাসের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করায় বাংলাদেশ ২০১০ সালে জাতিসংঘ পুরস্কার লাভ করেছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ- ১ : আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জনসংখ্যানীতির ভূমিকা আলোচনা কর।

কাজ- ২ : জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কোন পদক্ষেপটি তোমার এলাকার জন্য বেশি কার্যকর বলে তুমি মনে কর? ব্যাখ্যা কর।

পাঠ- ৩ : জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বেসরকারি উদ্যোগ

স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো (NGO) বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মুক্তিযুদ্ধের পরে বাংলাদেশের মানুষকে পুনর্বাসনে সহায়তার মাধ্যমে তাদের কাজ শুরু করে। বর্তমানে এই সংস্থাগুলোর কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হচ্ছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশে কর্মরত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর কার্যক্রম নিচে তুলে ধরা হলো :

ক. **কমিউনিটিভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প** : এই প্রকল্পের আওতায় গ্রাম ও শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পরিবার ছোট রাখার জন্য পরামর্শ ও শিক্ষা দেওয়া হয়। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে তাদের উৎসাহ দেওয়া হয়। প্রকল্পের আওতায় মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, টিকা, ইনজেকশন ও পুষ্টি শিক্ষা বিষয়েও সেবা প্রদান করা হয়।

খ. **দুই সন্তানের পরিকল্পিত পরিবার গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়ন** : বাংলাদেশ সরকার দুটি সন্তানের পরিবার গড়ার জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। বেসরকারি সংস্থাগুলো এই লক্ষ্য অর্জনে কাজ করছে। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যও তারা কাজ করছে।

গ. **বাল্যবিবাহ রোধ ও বিলম্বে বিয়ের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ** : দেশে বাল্যবিবাহ রোধ ও বিবাহ বিলম্বিত করার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রেও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ঘ. **প্রশিক্ষণ কার্যক্রম** : বেসরকারি সংস্থাগুলোর বিশেষজ্ঞরা মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সেবা, টিকা দান ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে জনগণকে প্রশিক্ষিত করছে।

ঙ. **সচেতনতা কার্যক্রম** : জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবেলায় বেসরকারি সংস্থাগুলো জনগণকে সচেতন করার জন্য নানা উপকরণ তৈরি ও ব্যবহার করে। যেমন : পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সাময়িকী, পোস্টার, ক্যালেন্ডার, চার্ট, নিউজলেটার, ডকুমেন্টারি ফিল্ম ইত্যাদি।

চ. **ধর্মীয় নেতাদের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি** : বেসরকারি সংস্থাগুলো স্থানীয় ধর্মীয় নেতাদের জন্য কর্মশালা আয়োজন করে তাঁদের এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে। ধর্মীয় নেতারাও জনসংখ্যা হ্রাসের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ– ১ : জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

পাঠ– ৪ ও ৫ : জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা

জমির পরিমাণ হিসাব করলে ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা এমনিতেই খুব বেশি। উপরন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও এখানে বেশি। যদিও আগের তুলনায় বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিছুটা কমে এসেছে। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম এবং মানুষের ক্রমবর্ধমান সচেতনতার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির ফলে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার ইদানীং কমে এসেছে। এর ফলেও দেশে জনসংখ্যা বাড়ছে। দেশের অশিক্ষিত ও কর্মহীন জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে তরুণদের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে জনসংখ্যাকে অনায়াসে জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব। এভাবে দেশ দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে।

জনসংখ্যাকে সম্পদে রূপান্তরের কৌশল

সম্পদ যেখানে সীমিত সেখানে একটি দেশের বিশাল জনসংখ্যা তার জন্য বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তবে উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়ে জনসংখ্যাকে জনসম্পদেও পরিণত করা যায়। বিশ্বের অনেক দেশ ইতোমধ্যে তাদের বিশাল জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করেছে। এ ব্যাপারে আমরা চীনের উদাহরণ দিতে পারি। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত ও শ্রীলঙ্কাও জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার ক্ষেত্রে সাফল্য দেখিয়েছে। বিশেষ করে তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ভারত আজ বেশ এগিয়ে। এমন কি আমেরিকার মতো উন্নত দেশেরও তথ্য-প্রযুক্তিখাতের ২৩ ভাগ ভারতীয় দক্ষ জনশক্তির উপর নির্ভরশীল। আমাদের দেশও বিগত বছরগুলোতে তথ্য-প্রযুক্তিখাতে প্রচুর বিনিয়োগ করেছে। সরকার এদেশের যুবশক্তিকে সম্পদে রূপান্তরের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আগামী দিনে যার সুফল পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। আমাদের দেশে জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করার জন্য নেয়া কৌশলগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো :

কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা

দক্ষতাবৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ

প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার

নারীশিক্ষার প্রসার

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমের প্রসার

উৎপাদনমুখী খাতের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ

কৃষিভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সম্প্রসারণ

কর্মসংস্থানের জন্য কৃষির আধুনিকীকরণ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে অগ্রাধিকার প্রদান

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিস্তার

সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে প্রচুর বৃত্তির ব্যবস্থা করে অধিক সংখ্যক মেধাবী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা ও উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিশ্বের উন্নত ও প্রযুক্তি-নির্ভর দেশগুলোতে প্রেরণ।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ– ১ : জনসংখ্যা কখন জনসম্পদে পরিণত হতে পারে? লেখ।

কাজ– ২ : জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণত করার উপায়গুলো আলোচনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. প্রতি বছর কোন তারিখ বাংলাদেশের জাতীয় জনসংখ্যা দিবস উদযাপন করা হয়?

ক. ২রা ফেব্রুয়ারি গ. ৮ই মার্চ
খ. ২১শে ফেব্রুয়ারি ঘ. ১লা মে

২. বাংলাদেশে জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করার উপায় হচ্ছে—

i . শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ
ii. কৃষি, শিল্প এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অগ্রাধিকার
iii. দক্ষ জনশক্তিকে বিদেশে রপ্তানি করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i গ. ii
খ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

ক্রমিক নং	দেশ	প্রতি বর্গ কি.মি. জনসংখ্যা	মাথাপিছু আয় (মার্কিন ডলারে)
১	আমেরিকা	৩২	৪৬,৯৭০
২	ভারত	৩৮২	১,৩৭১
৩	বাংলাদেশ	৯৯৩	৮১৬

উৎস : পাঠ্যপুস্তক ও wikipedia ২০১০-১১

ক. ২০১০ সালে বাংলাদেশ কোন ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য জাতিসংঘ পুরস্কার লাভ করেছে?
খ. জনসংখ্যানীতি বলতে কী বোঝায়?
গ. উপরের তালিকা অনুসারে বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে বাধা কোনটি? বর্ণনা কর।
ঘ. ছকে বর্ণিত ২ নং দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে কীভাবে বাংলাদেশ জনসম্পদে সমৃদ্ধ হতে পারবে— আলোচনা কর।

অধ্যায়–দশ
বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা

বাংলাদেশে নানা সামাজিক সমস্যা রয়েছে। তার মধ্যে কিশোর অপরাধ ও মাদকাসক্তি দুটি বড় সমস্যা। বর্তমানে এ দুটি সমস্যা সবার উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পাঠ–১ : কিশোর অপরাধের ধারণা ও কারণ

অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে বা কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত বিভিন্ন ধরনের অপরাধকেই বলা হয় কিশোর অপরাধ। কোন বয়স পর্যন্ত অপরাধীকে কিশোর অপরাধী বলা হবে তা নিয়ে অবশ্য বিভিন্ন দেশের সমাজবিজ্ঞানী ও আইনবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলঙ্কায় ৭ থেকে ১৬ বছর বয়সী কিশোরদের অপরাধমূলক কাজকে কিশোর অপরাধ বলা হয়। অন্যদিকে পাকিস্তান ও থাইল্যান্ডে কিশোর অপরাধীর বয়সসীমা ধরা হয় ৭ থেকে ১৮ বছর। আর জাপানে এ বয়সসীমা ১৪ থেকে ২০ বছর। কিশোর অপরাধীরা রাষ্ট্র ও সমাজের আইন ও নিয়ম ভাঙে বলেই তারা কিশোর অপরাধী।

যেসব কাজ কিশোর অপরাধের পর্যায়ে পড়ে সেগুলো হচ্ছে চুরি, খুন, জুয়া খেলা, স্কুল পালানো, বাড়ি থেকে পালানো, পরীক্ষায় নকল করা, বিদ্যালয় ও পথেঘাটে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, পকেটমারা, মারপিট করা, বোমাবাজি, গাড়ি ভাঙচুর, বিনা টিকিটে ভ্রমণ, পথেঘাটে মেয়েদের উত্যক্ত করা, এসিড নিক্ষেপ, নারী নির্যাতন, পর্নো বা নোংরা ছবি দেখা, মাদক গ্রহণ ইত্যাদি। আমাদের দেশের কিশোর অপরাধীরা সাধারণত এসব অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকে।

শিশু-কিশোররা নানা কারণে অপরাধী হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে কিশোর অপরাধের অন্যতম প্রধান কারণ দারিদ্র্য। দরিদ্র পরিবারের কিশোরদের অনেক সাধ বা ইচ্ছাই অপূর্ণ থেকে যায়। এর ফলে তাদের মধ্যে বাড়ে হতাশা এবং এ হতাশাই তাদের অপরাধের দিকে ঠেলে দেয়। সুস্থ পারিবারিক জীবন ও সুষ্ঠু সামাজিক পরিবেশের অভাবেও শিশু-কিশোররা অপরাধী হয়ে উঠতে পারে। বাড়ির বাইরে বা কর্মস্থলে অতি ব্যস্ততার কারণে পিতামাতার পক্ষে তাঁদের সন্তানদের যথেষ্ট সময় বা মনোযোগ দিতে না পারা, আদর-যত্নের অভাব, পিতামাতার অকাল মৃত্যু বা বিবাহবিচ্ছেদ, এমন কি অভিভাবকদের অতিরিক্ত শাসনের কারণেও অনেক কিশোর অপরাধী হয়ে ওঠে। পিতামাতার মধ্যকার জটিল দাম্পত্য সম্পর্ক ও তাঁদের খারাপ আচরণও অনেক সময় কিশোর-কিশোরীদের অপরাধপ্রবণ করে তোলে। সংসারত্যাগী, অপরাধী, দুশ্চরিত্র এবং অযোগ্য ও উদাসীন পিতামাতার সন্তানরাও পরিবারে অসংগত আচরণ করে এবং পরে অপরাধী হিসাবে বেড়ে উঠে।

চিত্তবিনোদনের অভাবের কারণেও অনেক কিশোর-কিশোরী অপরাধী হয়ে ওঠে। ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলা, সংগীত, ছবি আঁকা, শরীর চর্চা ও বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত শিশু-কিশোররা সাধারণত আনন্দময় পরিবেশে ও সুস্থভাবে বেড়ে উঠে। অন্যদিকে যারা এসবের সুযোগ পায় না তারা মানসিক অস্থিরতা থেকে মুক্তির অন্য পথ খোঁজে। তারাই পরে নানা রকম অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে।

শহরের বিভিন্ন এলাকায় ও শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক বস্তি রয়েছে। বস্তির পরিবেশ ও সেখানকার নানা খারাপ অভিজ্ঞতা শিশু-কিশোরদের অপরাধী করে তোলে। সঙ্গদোষে এবং অভাবের তাড়নায়ও বস্তির শিশু-কিশোররা অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। দরিদ্র শিশু-কিশোররা অল্পবয়সেই নানা রকম কাজ করে টাকা উপার্জন করতে বাধ্য হয়। এই টাকায় কখনো কখনো তারা জুয়া খেলে, মদ-গাঁজা খায় এবং নোংরা ছবি দেখে। অর্থ উপার্জন করতে গিয়ে বা লোভে পড়েও তারা অনেক সময় অপরাধের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

শারীরিক-মানসিক ত্রুটি বা বৈকল্য শিশুমনে হীনমন্যতার জন্ম দেয়। এর ফলেও অনেকে অপরাধী হতে পারে। আবার বেশি রকম আবেগপ্রবণ বা প্রতিভাবান শিশু-কিশোররাও অনেক সময় অপরাধী হয়ে উঠে। কারণ এ ধরনের শিশু-কিশোরদের মানসিক গঠন সাধারণের চেয়ে জটিল হয়। তারাও তাদের প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে অপরাধী হয়ে উঠতে পারে।

যেসব পিতামাতা বারবার কর্মস্থল পরিবর্তন করেন তাঁদের সন্তানরা নতুন নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। সঙ্গী বা বন্ধু নির্বাচনে তাদের সমস্যা হয়। এভাবে সঙ্গদোষেও কেউ কেউ অপরাধী হতে পারে। বর্তমানে মোবাইল ও ইন্টারনেটের অপব্যবহারের ফলেও সমাজে এক ধরনের কিশোর অপরাধ দেখা যাচ্ছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ-১ : কী কী কারণ শিশু-কিশোরদের অপরাধী করে তোলে? উল্লেখ কর।

পাঠ-২ : কিশোর অপরাধের প্রভাব ও প্রতিরোধ

বাংলাদেশে কিশোররা সাধারণত যে-সব অপরাধ করে তার মধ্যে রয়েছে চুরি, পকেটমার, বিনা টিকিটে রেলভ্রমণ; মানুষ, দোকানপাট, বাড়িঘর ও যানবাহনের উপর হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও অন্যান্য নাশকতামূলক কাজ এবং মেয়েদের উত্যক্ত করা প্রভৃতি। এছাড়াও কিশোর অপরাধীরা অনেক সময় দলবেঁধে ডাকাতি এবং ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করে থাকে। কখনো কখনো তারা খুন পর্যন্ত করে। যে পরিবারে এ রকম কিশোর অপরাধী আছে তাদের পারিবারিক শান্তি বিনষ্ট হয়।

ইদানীং বাংলাদেশের শহর ও গ্রামাঞ্চল সর্বত্র কিশোর অপরাধীদের দ্বারা মেয়েদের উত্যক্ত করার ঘটনা বেড়ে চলেছে। তারা মেয়েদের প্রতি অশ্লীল ও অশোভন উক্তি করে। এদের কারণে মেয়েরা নিরাপদে স্কুলে-কলেজে যাতায়াত করতে পারে না। বখাটে কিশোরদের অন্যায় প্রস্তাবে সাড়া না দিলে তারা মেয়েদের অপহরণ, শারীরিক নির্যাতন বা তাদের উপর এসিড নিক্ষেপ করে। প্রতিবাদ করতে গিয়ে অনেক সময় অভিভাবকরাও তাদের আক্রমণের শিকার হয়। এসব বখাটের উৎপাতে কখনো কখনো ছাত্রীদের পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। কিশোর অপরাধীরা অনেক সময় মাদকাসক্তি ও অন্যান্য খারাপ অভ্যাসের সঙ্গে জড়িত থাকে।

প্রতিরোধের উপায়

বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ প্রবণতা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এ সমস্যার প্রতিরোধে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন :

অভিভাবক সচেতনতা ও দায়িত্ব

কিশোরদের অপরাধ প্রবণতার ধরন, তার কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে পিতামাতা ও পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠরা যদি সচেতন থাকেন তবে তাঁরা সহজেই কিশোরদের অপরাধ থেকে দূরে রাখতে বা সে পথ থেকে সরিয়ে আনতে পারবেন। এজন্য পরিবারে সন্তানদের সুস্থ মানসিক বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। তাদের চলাফেরার উপর নজর রাখতে হবে। তাদের বন্ধু ও সাথিদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখতে হবে। সন্তানদের সঙ্গে সহজ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি

পরিবারের দারিদ্র্য কিশোরদের অপরাধ প্রবণতার একটি প্রধান কারণ। সেজন্য অভিভাবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে। এ ব্যাপারে সরকার এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাকে এগিয়ে আসতে হবে।

শিক্ষার সুযোগ

সকল শিশু-কিশোরকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার আওতায় আনতে হবে। এতে তারা একদিকে শিক্ষার প্রভাবে সুস্থ ও সুন্দর জীবন-যাপনে আগ্রহী হবে। অন্যদিকে বিদ্যালয়ের পরিবেশ তাদেরকে অপরাধ থেকে দূরে রাখবে।

চিত্তবিনোদন

শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশের জন্য পাড়া ও মহল্লায় পাঠাগার, ব্যায়ামাগার প্রভৃতি স্থাপন করা প্রয়োজন। এছাড়া বিদ্যালয়ে ও আবাসিক এলাকায় খেলার মাঠ থাকতে হবে।

উপরে উল্লিখিত কার্যক্রম ছাড়াও শিশু-কিশোরদের সব রকম খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখতে হবে। এজন্য টেলিভিশনে ও অন্যান্য উপায়ে তাদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্যমূলক এবং বিশুদ্ধ আনন্দদায়ক দেশি ও বিদেশি ছায়াছবি দেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। পর্নোগ্রাফি, ব্লুফিল্ম ও বিভিন্ন অশ্লীল প্রকাশনা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিতে হবে। শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করতে হবে। শিশু-কিশোররা যেন খারাপ সঙ্গে না পড়ে সে ব্যাপারে তাদের নিজেদের যেমন সতর্ক থাকতে হবে, তেমনি অভিভাবকদেরও এ ব্যাপারে সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে ।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : কিশোর অপরাধ রোধে কী কী কাজ করা যেতে পারে? আলোচনা কর।

পাঠ–৩ : মাদকাসক্তির কারণ

মাদকাসক্ত–সঙ্গীদের সাথে মেলামেশার মধ্য দিয়েই প্রধানত মাদকাসক্তির সূত্রপাত ঘটে। মাদকের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে না জেনেই, কেবল সাময়িক উত্তেজনা লাভের জন্য ও বন্ধুদের প্ররোচনায় কিশোর-কিশোরীরা মাদকদ্রব্য সেবন করে। পরে তা তাদের মরণনেশায় পরিণত হয়। কিশোর-মন স্বভাবতই কৌতূহলপ্রবণ। ফলে স্রেফ কৌতূহলের বশেও অনেকে মাদক গ্রহণ করা শুরু করে। পিতা বা বাড়ির অন্য বয়স্কদের পকেট থেকে বিড়ি-সিগারেট চুরি করে শিশু-কিশোররা অনেক সময় তাদের কৌতূহল মিটায়। এই কৌতূহল থেকে একসময় তাদের ধূমপানের অভ্যাস গড়ে ওঠে। এই ধূমপান থেকেই তারা পরে অন্যান্য নেশাদ্রব্য যেমন গাঁজা, ফেনসিডিল, হেরোইন, ইয়াবা প্রভৃতিতে আসক্ত হয়ে পড়ে।

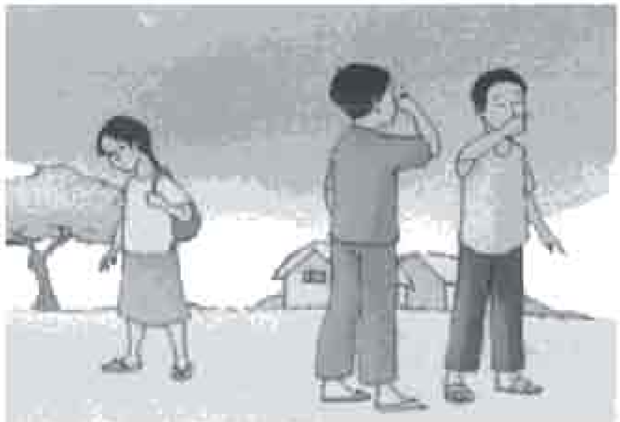

বন্ধুদের প্ররোচনায় ধূমপানে আসক্তি

বেকারত্ব, নিঃসঙ্গতা, প্রিয়জনের মৃত্যু, প্রেমে ব্যর্থতা, পারিবারিক অশান্তি ইত্যাদি কারণে অনেকের মনে হতাশার সৃষ্টি হয়। আর এই হতাশা থেকে মুক্তি লাভের আশায় প্রথমে বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে বা তাদের দেখাদেখি অনেকে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করতে শুরু করে। পরে এটা তাদের নেশায় পরিণত হয়। পিতামাতার স্নেহ বা মনোযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে কিংবা পারিবারিক অশান্তি ও ঝগড়াবিবাদ থেকেও অনেক সময় শিশু-কিশোরদের মনে হতাশা জন্ম নেয়। এক পর্যায়ে তারা মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ে।

অপসংস্কৃতির প্রভাবও মাদকাসক্তির পিছনে একটি বড় কারণ হিসাবে কাজ করে। চলচ্চিত্র, টিভি চ্যানেল, ইন্টারনেট প্রভৃতির মাধ্যমে আজকাল এক দেশের সংস্কৃতি সহজেই অন্য দেশের সংস্কৃতি ও জনজীবনকে প্রভাবিত করছে। দুই ভিন্ন সংস্কৃতির টানাপোড়েনে পড়েও যুব সমাজের একটা অংশ বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মাদকে আকৃষ্ট হচ্ছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : শিশু-কিশোরদের মাদকাসক্ত হওয়ার পিছনে কী কী কারণ কাজ করে? আলোচনা কর।

পাঠ–৪ : মাদকাসক্তির প্রভাব ও প্রতিরোধ

আমাদের সমাজজীবনে মাদকাসক্তি বর্তমানে একটি ভয়াবহ সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। এটি আমাদের সামাজিক ও নৈতিক জীবনেও মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। শারীরিক ক্ষতির মধ্যে একজন মাদক গ্রহণকারীর হৃদরোগ, যক্ষ্মা, ক্যান্সার ও শ্বাসকষ্ট হতে পারে। তার মানসিক স্বাস্থ্যও এর

ফলে দুর্বল হয়ে পড়ে। মাদক গ্রহণকারীরা হতাশা ও হীনম্মন্যতায় ভোগে। নিজেদের ক্ষতি তো এরা করেই, উপরন্তু ভয়, উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনার শিকার হয়ে সমাজেও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে।

পারিবারিক জীবনে মাদকের প্রভাব নানা জটিল সমস্যা সৃষ্টি করে। পুরো পরিবারের সুখ-শান্তিকে তা নষ্ট করে। যে পরিবারে একটিও মাদকাসক্ত সন্তান থাকে সে পরিবারে ঝগড়াঝাটি লেগেই থাকে। প্রতিবেশীদের কাছে ঐ পরিবারের মর্যাদা থাকে না। মাদকের টাকার যোগান দিতে গিয়ে অনেক সময় পরিবারটি একেবারে নিঃস্ব হয়ে যায়। তাছাড়া হত্যা, আত্মহত্যা, বাড়ি থেকে পালানো বা নিরুদ্দেশ হওয়ার মতো ঘটনাও ঘটে। যে দেশে সহজেই মাদক পাওয়া যায় সেখানে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি ও হত্যার ঘটনাও ঘটে বেশি। মাদকের প্রভাবে সামাজিক অস্থিরতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দেয়। মাদকের হাত থেকে সমাজের মানুষকে রক্ষা করার জন্য তাই মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও মাদক নিয়ন্ত্রণ করতে হবে । এ জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে:

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

মাদকাসক্তি রোধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাই সবচেয়ে ভালো ও কার্যকর। এ জন্য সমাজে নৈতিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে। সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ শেখানোর জন্য অভিভাবক ও পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের সচেষ্ট হতে হবে। মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব এবং মাদক সম্পর্কে ধর্মে যেসব বিধিনিষেধ রয়েছে সবাইকে তা জানাতে হবে। মোটকথা ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে ও অন্যান্য উপায়ে মাদকবিরোধী সচেতনতা ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

স্থানীয় পর্যায়ে মসজিদ-মন্দির প্রভৃতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ক্লাব-সমিতি প্রভৃতি সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংস্থাগুলো নৈতিকতা শিক্ষার পাশাপাশি মাদকাসক্তি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তারা আলোচনা সভার আয়োজন করে মাদকের মারাত্মক কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে পারে। নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'মাদককে না বলুন'— এই প্রতিজ্ঞায় জনগণ বিশেষ করে তরুণদের উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এছাড়া সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, পোস্টার, বিলবোর্ড ও লিফলেট ইত্যাদির মাধ্যমেও মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে।

সুস্থ চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করে শিশু-কিশোরদের সেদিকে আকর্ষণ করতে হবে যাতে তারা মাদক গ্রহণ ও অন্যান্য খারাপ অভ্যাসের দিকে ঝুঁকে না পড়ে। একই সঙ্গে কুরুচিপূর্ণ চলচ্চিত্র ও পর্নোগ্রাফির প্রচার বন্ধ করা দরকার। এছাড়াও মাদকাসক্তি প্রতিরোধে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলোও গ্রহণ করা জরুরি :

ধূমপান ও অন্যান্য নেশাজাতীয় দ্রব্যের উৎপাদন ও বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ করতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে নেশা বা মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচার চালাতে হবে। মাদক উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত শ্রমিকদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। ছাত্রদের সামনে শিক্ষকের ধূমপানকে অপরাধ হিসাবে গণ্য করতে হবে। ঔষধ হিসাবে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত মাদকজাতীয় দ্রব্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ।

অনুশীলনমূলক কাজ

| কাজ–১ | : আমাদের সমাজে মাদকাসক্তি রোধে কী কী ব্যবস্থা নেয়া যায়? আলোচনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. **আমাদের দেশে কিশোর অপরাধের প্রধান কারণ কী?**

ক. দারিদ্র্য   গ. আদর-যত্নের অভাব
খ. বিবাহবিচ্ছেদ   ঘ. চিত্তবিনোদনের অভাব

২. **মাদকাসক্তি প্রতিরোধে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা হচ্ছে—**

i . ধর্মীয় শিক্ষায় গুরুত্ব দেওয়া
ii. নৈতিক মূল্যবোধ শেখানো
iii. মাদকজাতীয় দ্রব্যের উৎপাদন নিষিদ্ধ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii   গ. ii ও iii
খ. i ও iii   ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

তারিক পিতা-মাতার আদরের সন্তান । ইদানীং তার আচরণে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। স্কুলে না গিয়ে সে লুকিয়ে লুকিয়ে ধূমপান করে এবং টাকার জন্য মাকে প্রায়শই উত্যক্ত করে।

৩. **তারিকের আচরণটিতে কী প্রকাশ পায় ?**

ক. শিশু অপরাধ   গ. মূল্যবোধের অবক্ষয়
খ. মাদকাসক্তি   ঘ. নিঃসঙ্গতা

৪. **উদ্দীপকে বর্ণিত তারিকের আচরণের ফলে—**

i . বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা দেখা দিবে
ii. মানসিক স্বাস্থ্যের তেমন পরিবর্তন হবে না
iii. সামাজিক জীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii   গ. ii ও iii
খ. i ও iii   ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জনাব সাঈদ লক্ষ করলেন কয়েক মাস যাবত তার মেয়ে বিদ্যালয়ে একা যেতে সংকোচবোধ করছে। কারণ তার এলাকার ১৩–১৪ বৎসর বয়সী কয়েকজন ছেলে বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে মেয়েদেরকে নানাভাবে উত্যক্ত করে। বিষয়টি তাকে চিন্তিত করে তুলল। তিনি এ সমস্যা সমাধানের জন্য অভিভাবকদের সাথে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

ক. মাদকাসক্তি রোধে কোন প্রতিজ্ঞায় তরুণদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে?
খ. অপসংস্কৃতির প্রভাব মাদকাসক্তির বড় কারণ—বুঝিয়ে লিখ।
গ. কোন ধরনের সামাজিক সমস্যার কারণে জনাব সাঈদ চিন্তিত—ব্যাখ্যা কর।
ঘ. জনাব সাঈদের গৃহীত উদ্যোগের কার্যকারিতা মূল্যায়ন কর।

অধ্যায়–এগার

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী

বাংলাদেশে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাঙালিদের পাশাপাশি বহু ভাষাভাষী মানুষ সুদীর্ঘকাল ধরে বসবাস করে আসছে। এ অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভৌগোলিক অবস্থান এবং তাদের কয়েকটি যেমন : চাকমা, গারো, সাঁওতাল, মারমা ও রাখাইনদের জীবনধারা, সামাজিক রীতিনীতি ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে জানব ।

পাঠ – ১ বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভৌগোলিক অবস্থান

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রধান একটি অংশ বাস করে এ দেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায়। এসব জেলায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীগুলো হলো—চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, পাংখুয়া, চাক, খ্যাং, খুমি এবং লুসেই। রক্ত ও শারীরিক গঠনের বিচারে এরা মঙ্গোলিয় জনগোষ্ঠীর লোক।

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাংশেও মঙ্গোলিয় জনগোষ্ঠীর বাস রয়েছে। এদের মধ্যে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের গারো, হাজং, কোচ এবং বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের খাসি বা খাসিয়া ও মণিপুরি প্রভৃতি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নাম উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশের দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা প্রভৃতি এলাকায় এবং উত্তর-পূর্বাংশের বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলেও নানা ক্ষুদ্র জাতিসত্তার লোক বসবাস করে। এদের মধ্যে রয়েছে সাঁওতাল, ওরাঁও, মাহালি, মুন্ডা, মাল পহাড়ি, মালো প্রভৃতি।

এছাড়াও কক্সবাজার, পটুয়াখালি ও বরগুনা জেলায় বাস করে রাখাইন জনগোষ্ঠীর মানুষ।

বাংলাদেশে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী রয়েছে। এরা হলো ডালু, হদি, রাজবংশী, সূর্যবংশী বর্মণ, বানাই, পাথর, মাহাতো ও কোল।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নাম, আবাসস্থল ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় উল্লেখ কর।

ক্ষুদ্র নৃ–গোষ্ঠীর নাম	আবাসস্থল	নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

কাজ–২ : বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করে প্রধান প্রধান ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভৌগোলিক অবস্থান শনাক্ত কর।

পাঠ– ২ : চাকমা

বাংলাদেশের রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় বসবাসকারী প্রধান ক্ষুদ্র জাতিসত্তা হলো চাকমা।

চাকমা নারী

নৃ–তাত্ত্বিক বিচারে চাকমারা মঙ্গোলিয় জনগোষ্ঠীর লোক। তাদের মুখমণ্ডল গোলাকার, নাক চ্যাপ্টা, চুল সোজা এবং কালো, গায়ের রং ঈষৎ হলদেটে। বাংলাদেশের বাইরেও চাকমারা ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম ও অরুণাচলে বসবাস করে।

সামাজিক জীবন : চাকমা সমাজে মূল অংশ পরিবার। কতকগুলো চাকমা পরিবার নিয়ে গঠিত হয় 'আদাম' বা 'পাড়া'। কতগুলো পাড়া নিয়ে গঠিত হয় মৌজা। পাড়ার প্রধানকে বলা হয় হেডম্যান। হেডম্যান মৌজার শান্তি –শৃঙ্খলা রক্ষা করেন। কয়েকটি মৌজা মিলে চাকমা সার্কেল গঠিত হয় এবং এর প্রধান হলেন চাকমা রাজা। চাকমা সমাজে রাজার পদটি বংশানুক্রমিক।

চাকমা সমাজ পিতৃসূত্রীয়। চাকমা পরিবারে পিতাই প্রধান। তারপরে মা ও জ্যেষ্ঠপুত্রের স্থান।

অর্থনৈতিক জীবন : চাকমাদের জীবিকার প্রধান উপায় হচ্ছে কৃষি কাজ। যে পদ্ধতিতে তারা চাষ করে তাকে বলা হয় 'জুম'। তবে বর্তমান সময়ে তারা হালচাষেও অভ্যস্ত হয়েছে।

ধর্মীয় জীবন : চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাদের অধিকাংশ গ্রামে 'কিয়াং' বা বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে। চাকমারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় দিনকে ভক্তি সহকারে পালন করে। এর মধ্যে গৌতম বুদ্ধের জন্ম, মৃত্যু ও বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির দিনটি তারা সাড়ম্বরে 'বৈশাখী পূর্ণিমা' হিসেবে পালন করে। তাছাড়া মাঘী পূর্ণিমার রাতে কিয়াং বা প্যাগোডার প্রাঙ্গণে গৌতম বুদ্ধের সম্মানে ফানুস ওড়ায়। চাকমা সমাজে মৃতদেহ দাহ করা অর্থাৎ পোড়ানো হয়।

সাংস্কৃতিক জীবন

চাকমারা নিজেদের তাঁত দিয়ে পোশাক তৈরি করে। চাকমা মেয়েদের পরনের কাপড়ের নাম 'পিনোন' এবং 'হাদি'। পূর্বে চাকমা পুরুষেরা এক রকম মোটা সুতার জামা, ধুতি ও গামছা পরতো এবং মাথায় এক রকম পাগড়ি বাঁধতো। ইদানীং তারা সার্ট, প্যান্ট ও লুঙ্গি ব্যবহার করে। চাকমা মহিলাদের তৈরি বিভিন্ন কাপড়ের মধ্যে 'ফুলগাদি' ও নানা ধরনের ওড়না দেশি ও বিদেশি সবার কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। চাকমারা বাঁশ ও বেত দিয়ে সুন্দর সুন্দর ঝুড়ি, পাখা, চিরুনি, বাঁশি এবং বাদ্যযন্ত্র তৈরি করে।

চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক

চাকমাদের প্রধান খাদ্য ভাত। তারা ভাতের সাথে মাছ, মাংস এবং শাকসবজি খেতে ভালোবাসে। তাদের প্রিয় খাদ্য বাঁশ কোড়ল। বাঁশ

কোড়ল দিয়ে চাকমা মেয়েরা বেশ কয়েক ধরনের রান্না ও ভাজি করে। চাকমারা হা-ডু-ডু, কুস্তি এবং 'ঘিলাখারা' খেলতে ভালোবাসে। ছোট ছোট মেয়েরা 'বউচি' খেলে।

চাকমাদের শ্রেষ্ঠ উৎসব হলো 'বিজু'। বাংলা বর্ষের শেষ দুদিন ও নববর্ষের প্রথম দিনে চাকমারা বিজু উৎসব পালন করে। অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিসত্তার তুলনায় চাকমারা তুলনামূলকভাবে বেশি শিক্ষিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ-১ : চাকমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।

নং	জীবনব্যবস্থা	বৈশিষ্ট্য
১	সামাজিক	
২	অর্থনৈতিক	
৩	সাংস্কৃতিক	
৪	ধর্মীয়	

পাঠ- ৩ : গারো

বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর মধ্যে গারোরা হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ। গারোরা ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইলের মধুপুর, নেত্রকোণা, শেরপুর, জামালপুর ও গাজীপুরের শ্রীপুরে বাস করে। বৃহত্তর সিলেট জেলায়ও কিছু সংখ্যক গারো রয়েছে। বাংলাদেশের বাইরে ভারতের মেঘালয় ও অন্যান্য রাজ্যেও গারোরা বাস করে। বাংলাদেশের গারোরা সাধারণত সমতলের বাসিন্দা।

গারো পরিবার

এই জাতি-গোষ্ঠীর আদি বাসস্থান ছিল তিব্বত। গারোরা সাধারণত 'মান্দি' নামে নিজেদের পরিচয় দিতে পছন্দ করে। গারোরা মঙ্গোলিয় জনগোষ্ঠীর লোক।

সামাজিক জীবন : গারোদের সমাজ মাতৃসূত্রীয়। তাদের সমাজে মাতা হলেন পরিবারের প্রধান। সন্তানেরা মায়ের উপাধি ধারণ করে। পরিবারের সর্বকনিষ্ঠা কন্যা পরিবারের সমুদয় সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে থাকে। গারো পরিবারে পিতা সংসার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে।

গারো সমাজের মূলে রয়েছে মাহারি বা মাতৃগোত্র পরিচয়। তাদের সামাজিক জীবনে বিশেষত বিয়ে, উত্তরাধিকার, সম্পত্তির ভোগ-দখল ইত্যাদিতে এই মাহারির গুরুত্ব অপরিসীম। মাতার বংশ ধরেই গারোদের চাৎচি (গোত্র) ও মাহারি (মাতৃগোত্র) নির্ণয় করা হয়। গারো সমাজে একই মাহারির পুরুষ ও মহিলার মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ। বর ও কনেকে ভিন্ন ভিন্ন মাহারির অন্তর্ভুক্ত হতে হয়।

গারো সমাজে বেশ কয়েকটি দল রয়েছে। এরকম প্রধান পাঁচটি দল হচ্ছে : সাংমা, মারাক, মোমিন, শিরা ও আরেং।

অর্থনৈতিক জীবন : বাংলাদেশের গারোরা সাধারণত কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। পূর্বে গারোরা জুম চাষে অভ্যস্ত ছিল। বর্তমানে সমতলের গারোদের মধ্যে জুম চাষের প্রচলন নেই। তারা হাল চাষের সাহায্যে প্রধানত ধান, নানা জাতের সবজি ও আনারস উৎপাদন করে।

ধর্মীয় জীবন : গারোদের আদি ধর্মের নাম ছিল 'সাংসারেক'। অতীতে গারোরা বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করত। তাদের প্রধান দেবতার নাম ছিল তাতারা রাবুকা। গারোরা সালজং বা সূর্য, চোছুম বা চন্দ্র, গোয়েরা বা বজ্র, মেন বা মাটি প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা করত। নাচ-গান ও পশু বলিদানের মাধ্যমে তারা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করত।

বর্তমানে গারোদের অধিকাংশ লোক খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী। তারা এখন বড়দিনসহ বিভিন্ন খ্রিষ্ট ধর্মীয় উৎসব পালন করে।

সাংস্কৃতিক জীবন

গারো মহিলাদের নিজেদের তৈরি পোশাকের নাম 'দকমান্দা' ও 'দকশাড়ি'। পুরুষদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম 'গান্দো'।

গারো নারীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক

গারোরা ভাতের সাথে মাছ ও শাকসবজি খেয়ে থাকে। তাদের একটি বিশেষ খাদ্য হচ্ছে কচি বাঁশগাছের গুঁড়ি। এর জনপ্রিয় নাম 'মিউরা'। এছাড়াও তারা কলাপাতা মোড়ানো পিঠা, মেরা পিঠা এবং তেলের পিঠা খেতে পছন্দ করে।

গারোরা খুব আমোদ-প্রমোদপ্রিয়। তাদের সামাজিক উৎসবগুলো কৃষিকেন্দ্রিক। তাদের শ্রেষ্ঠ উৎসব হলো 'ওয়ানগালা'।

গারোদের ওয়ানগালা উৎসব

বাংলাদেশের গারোদের ভাষা 'মান্দি খুসিক'। এই ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা নেই। গারো ভাষা তিব্বতীয়-বর্মী ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

গারোরা মাটির উপর গাছ, বাঁশ ও ছন দিয়ে বাড়িঘর তৈরি করে। তবে অনেকে ছনের পরিবর্তে টিনের ও মাটির তৈরি ঘরেও বাস করে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ-১ : গারোদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

জীবনব্যবস্থা	বৈশিষ্ট্য
সামাজিক	
অর্থনৈতিক	
সাংস্কৃতিক	
ধর্মীয়	

পাঠ- ৪ : সাঁওতাল

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর মধ্যে একটি প্রধান জনগোষ্ঠী হলো সাঁওতাল। তারা রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া জেলায় বাস করে। ধারণা করা হয়, সাঁওতালদের পূর্বপুরুষরা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে বাংলাদেশের এসব অঞ্চলে আসে। আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারতীয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গেও বেশ কিছু সাঁওতাল বসবাস করে।

সাঁওতালরা অস্ট্রালয়েড জনগোষ্ঠীভুক্ত লোক। তাঁদের দেহের রং কালো, উচ্চতা মাঝারি ধরনের এবং চুল কালো ও ঈষৎ ঢেউ খেলানো।

সামাজিক জীবন : সাঁওতাল সমাজ হলো পিতৃসূত্রীয়। তাদের সমাজে পিতার সূত্র ধরে সন্তানের দল ও গোত্র পরিচয় নির্ণয় করা হয়। সাঁওতাল সমাজের মূল ভিত্তি হচ্ছে গ্রাম-পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েত পরিচালনার জন্য পাঁচজন 'মাঝি পরানিক' থাকে। এরা হলো মাঝিহারাম, জগমাঝি, পরানিক, গোডেৎ ও নায়েক। নায়েককে তারা পঞ্চায়েত সদস্য নয়, বরং ধর্মগুরু হিসাবে গণ্য করে।

অর্থনৈতিক জীবন : সাঁওতালদের প্রধান জীবিকা হলো কৃষি। বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর ও রংপুর জেলায় তারা মূলত কৃষিশ্রমিক হিসাবে কাজ করে। নারী ও পুরুষ উভয়ই ক্ষেতে কাজ করে। তারা ধান, সরিষা, তামাক, মরিচ, তিল, ইক্ষু প্রভৃতি ফসলের চাষ করে। তা ছাড়া বাঁশ, বেত, শালপাতা প্রভৃতি দ্বারা নানা প্রকার মাদুর, ঝাড়ু প্রভৃতি তৈরি করে নিজেদের প্রয়োজন মেটায় ও হাটে বিক্রি করে।

ধর্মীয় জীবন : সাঁওতাল জনগোষ্ঠী প্রধানত দুটি ধর্মের অনুসারী। তাদের এক অংশ সনাতন হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস করে এবং এই ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। অপর অংশ খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং তারা খ্রিস্টান ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে।

সাংস্কৃতিক জীবন : সাঁওতালদের প্রধান খাদ্য ভাত। সাধারণত সাঁওতালরা মাটির ঘরে বাস করে। তাদের বাড়ির দেয়াল মাটির তৈরি এবং তাতে খড়ের ছাউনি থাকে। সাঁওতালরা তাদের ঘর-বাড়ি খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে।

সাঁওতালদের নিজস্ব উৎসবাদির মধ্যে সোহরাই এবং ফাগুয়া উল্লেখযোগ্য। তাদের সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হলো 'ঝুমুর নাচ'। সাঁওতালদের বিবাহ অনুষ্ঠানে আয়োজিত হয় 'দোন' ও 'ঝিকা' নাচ।

সাঁওতাল মেয়েরা কাঁধের উপর জড়িয়ে শাড়ি পরে। পুরুষেরা লুঙ্গি পরে। সাঁওতালরা অলঙ্কারপ্রিয়। মেয়েরা হাতে ও গলায় পিতলের বা কাঁসার গয়না পরে। অনেক পুরুষ সাঁওতালও অলঙ্কার ব্যবহার করে। পুরুষদের কেউ কেউ গলায় মালা ও হাতে বালা পরে থাকে। মেয়ে ও পুরুষ উভয়ে বুকে ও হাতে উল্কি চিহ্ন ব্যবহার করে।

সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষিতের হার খুব কম হলেও বর্তমানে সাঁওতাল পরিবারের ছেলে-মেয়েরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হচ্ছে। বিশ শতকের প্রথম ভাগে সংঘটিত সাঁওতাল বিদ্রোহ উপমহাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। এই বিদ্রোহের নায়ক দুই ভাই সিধু ও কানুকে সাঁওতালরা বীর হিসেবে ভক্তি করে।

সাঁওতালদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ-১ : সাঁওতালদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

জীবনব্যবস্থা	বৈশিষ্ট্য
সামাজিক	
অর্থনৈতিক	
সাংস্কৃতিক	
ধর্মীয়	

পাঠ– ৫ : মারমা

মারমা মেয়ে

বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর মধ্যে জনসংখ্যার দিক থেকে মারমাদের অবস্থান দ্বিতীয়। মারমা জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় বাস করে। 'মারমা' শব্দটি 'ম্রাইমা' শব্দ থেকে উদ্ভূত।

সামাজিক জীবন : পার্বত্য অঞ্চলে বোমাং সার্কেলে মারমা সমাজের প্রধান হলেন বোমাং চীফ বা বোমাং রাজা।

প্রত্যেক মৌজায় কতগুলো গ্রাম রয়েছে। গ্রামবাসী গ্রামের প্রধান মনোনীত করে। মারমারা গ্রামকে তাদের ভাষায় 'রোয়া' এবং গ্রামের প্রধানকে 'রোয়াজা' বলে।

মারমা পরিবারে পিতার স্থান সর্বোচ্চে হলেও পারিবারিক কাজকর্মে মাতা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। মারমা সমাজে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মেয়েদের মতামত বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

অর্থনৈতিক জীবন : মারমাদের জীবিকার প্রধান উপায় হচ্ছে কৃষি। তাদের চাষাবাদের পদ্ধতিকে জুম বলা হয়।

ধর্মীয় জীবন : মারমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তারা এ ধর্মেরই অনুষ্ঠানাদি উদযাপন করে। প্রায় প্রত্যেকটি মারমা গ্রামে বৌদ্ধবিহার 'কিয়াং' এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু 'ভান্তে'দের দেখা যায়। মারমারা বৈশাখী পূর্ণিমা, আশ্বিনী পূর্ণিমা, কার্তিকী পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা ইত্যাদি দিনগুলোতে বৌদ্ধমন্দিরে গিয়ে ফুল দিয়ে এবং প্রদীপ জ্বালিয়ে বুদ্ধের পূজা করে। কাপ্তাইয়ের অনতিদূরে চন্দ্রঘোনার কাছে কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত 'চিৎমরম বৌদ্ধবিহার মারমাদের নির্মিত একটি খুবই সুন্দর বৌদ্ধবিহার। প্রতি বছর বহু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সেখানে বুদ্ধ প্রণাম ও পূজা করতে যায়।

সাংস্কৃতিক জীবন: মারমারা নদীর তীরে সমতল স্থানে তাদের গ্রামগুলো নির্মাণ করে। মারমাদের ঘরবাড়ি বাঁশ ও ছনের তৈরি।

মারমা পুরুষেরা মাথায় 'গমবং' (পাগড়ি বিশেষ), গায়ে জামা ও লুঙ্গি পরে। তাদের মহিলারা গায়ে যে ব্লাউজ পরে তার নাম 'আঙ্গি', এছাড়া তারা 'থামি' পরে। কাপড় বোনার কাজে মারমা নারীরা দক্ষ। তাদের মধ্যে হস্তচালিত ও কোমর উভয় ধরনের তাঁতের ব্যবহার রয়েছে।

মারমারা পার্বত্য অঞ্চলের অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মতো ভাতের সাথে মাছ-মাংস ও নানা ধরনের শাকসবজি খায়।

ঐতিহ্যবাহী পোশাকে মারমা নারী

মারমাদের সাংগ্রাই উৎসব

মারমারা পুরাতন বর্ষকে বিদায় ও নব বর্ষবরণ উপলক্ষে সাংগ্রাই উৎসব উদযাপন করে। এ সময় তারা 'পানিখেলা' বা 'জলোৎসব'–এ মেতে ওঠে। এই উৎসবে পানিখেলার নির্দিষ্ট স্থানে নৌকা বা বড় পাত্রে পানি রাখা হয়। বান্দরবান ও রাঙামাটিতে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে এই উৎসব বেশ আনন্দ-উদ্দীপনার সাথে উদযাপিত হয়ে থাকে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : মারমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।

জীবনব্যবস্থা	বৈশিষ্ট্য
সামাজিক	
অর্থনৈতিক	
সাংস্কৃতিক	
ধর্মীয়	

পাঠ– ৬ : রাখাইন

বাংলাদেশের পটুয়াখালী, বরগুনা ও কক্সবাজার জেলায় রাখাইনরা বাস করে। রাখাইনরা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক। তাদের মুখমণ্ডল গোলাকার, দেহের রং ফরসা ও চুলগুলো সোজা।

'রাখাইন' শব্দটির উৎপত্তি পালি ভাষার 'রাক্ষাইন' থেকে। এর অর্থ হচ্ছে রক্ষণশীল জাতি।

বর্তমান মায়ানমারের আরাকান অঞ্চল রাখাইনদের আদিবাস। রাখাইনরা এক সময় আরাকান থেকে এদেশে এসেছিল। তারা নিজেদের রাক্ষাইন নামে পরিচয় দিতে ভালোবাসে।

সামাজিক জীবন : রাখাইন পরিবার প্রধানত পিতৃসূত্রীয়। পিতাই পরিবারের প্রধান। তবে মেয়েদেরকে তারা শ্রদ্ধা করে।

অর্থনৈতিক জীবন : রাখাইনরা প্রধানত কৃষির উপর নির্ভরশীল। তবে এরই পাশাপাশি নিজস্ব হস্ত চালিত তাঁত থেকে কাপড় বোনার কাজও তারা করে থাকে।

ধর্মীয় জীবন : বাংলাদেশের রাখাইনরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। রাখাইন শিশু-কিশোরদের বৌদ্ধ মন্দিরে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হাতে ধর্মীয় শিষ্টাচারে দীক্ষিত করা হয়।

সাংস্কৃতিক জীবন : নদীর পাড় ও সমুদ্র উপকূলের সমতল ভূমিতে রাখাইনদের গ্রামগুলো অবস্থিত। রাখাইনরা মাচা পেতে ঘর তৈরি করে। তাদের কারও ঘরে গোলপাতার ছাউনি, আবার কারও ঘর টিনের হয়ে থাকে।

রাখাইনদের ঘরবাড়ি

রাখাইনদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক

রাখাইনরা নানা পালাপার্বণে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। এর মধ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিশেষ করে গৌতম বুদ্ধের জন্ম-বার্ষিকী, বৈশাখী পূর্ণিমা, বসন্ত উৎসব প্রধান। তবে চৈত্র-সংক্রান্তিতে রাখাইনরা যে সাংগ্রে উৎসব পালন করে সেটাই তাদের সবচেয়ে বৃহৎ ও সর্বজনীন আনন্দ উৎসব।

রাখাইন পুরুষেরা লুঙ্গি ও ফতুয়া পরে। পুরুষরা সাধারণত ফতুয়ার উপর লুঙ্গি পরে। মন্দিরে প্রার্থনাকালীন এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ও লোকজ অনুষ্ঠানে তারা মাথায় পাগড়ি পরে। পাগড়ি তাদের ঐতিহ্যের প্রতীক। রাখাইন মেয়েরা লুঙ্গি পরে। লুঙ্গির উপরে ব্লাউজ পরে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : রাখাইনদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর:

জীবনব্যবস্থা	বৈশিষ্ট্য
সামাজিক	
অর্থনৈতিক	
সাংস্কৃতিক	
ধর্মীয়	

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের কোন জাতিসত্তার ভাষার নাম–'মান্দি খুসিক'?

ক. চাকমা গ. গারো
খ. মারমা ঘ. সাঁওতাল

২. মারমা জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—

i . নদীতীরবর্তী সমতল স্থানে বসতি স্থাপন
ii. মাতৃপ্রধান পরিবার
iii. হস্তশিল্পে পারদর্শিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i গ. ii ও iii
খ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

বার্ষিক পরীক্ষা শেষে সুমাইয়া বাবা-মায়ের সঙ্গে কক্সবাজার বেড়াতে গিয়েছে। এখানে বেড়াতে বের হয়ে সে দেখতে পেল এক বিশেষ জনগোষ্ঠীর মানুষ মাচা পেতে ঘর তৈরি করে বাস করছে। তাদের মুখের আকৃতি গোল, দেহের রং ফরসা।

৩. সুমাইয়ার দেখা জনগোষ্ঠীর নাম কী?

ক. চাকমা গ. সাঁওতাল
খ. মারমা ঘ. রাখাইন

৪. সুমাইয়ার দেখা জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—

i . পরিবারের প্রধান হলেন বাবা
ii. প্রধান জীবিকা কৃষি
iii. ঘরবাড়ি বাঁশ ও ছনের তৈরি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   গ. i ও iii
খ. i ও ii   ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মাথিন চাকমা তার বান্ধবী শুভ্রার নানাবাড়ি ময়মনসিংহে বেড়াতে গেল। সেখানে সে লক্ষ করল সব ব্যাপারে শুভ্রার মায়ের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। তাতে সে একটু অবাকই হলো। বেড়াতে এসেই মাথিন শুভ্রাদের ধর্মীয় আচার-আচরণ, জীবিকা-নির্বাহ ইত্যাদি বিষয়গুলো খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেল।

ক. 'মারমা' শব্দটি কোন শব্দ থেকে উদ্ভূত ?
খ. 'সাংগ্রাই' উৎসবটি বুঝিয়ে লেখ।
গ. মাথিনের অবাক হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. মাথিন ও শুভ্রাদের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার তুলনা কর।

২. ৮ম শ্রেণির ছাত্র সাজিদ টেলিভিশনে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জীবনযাত্রার উপর নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র দেখছিল। এর প্রথম অংশে এক জনগোষ্ঠীর পরিচয় দেওয়া হলো যারা নদীতীরের সমতলে গ্রাম তৈরি করে বাস করে। এদের সমাজের প্রধান হলেন "বোমাং রাজা"। প্রামাণ্যচিত্রটির দ্বিতীয় অংশে আরেক জনগোষ্ঠীর পরিচয় দেওয়া হলো, যাদের নারী-পুরুষ উভয়ই জমিতে কাজ করেন। এরা অস্ট্রালয়েড শ্রেণিভুক্ত।

ক. চাকমাদের জীবিকার প্রধান উপায় কী?
খ. মাহারি কী? বুঝিয়ে লেখ।
গ. সাজিদের দেখা প্রামাণ্যচিত্রের প্রথম অংশে কোন জনগোষ্ঠীর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে? বর্ণনা কর।
ঘ. সাজিদের দেখা জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনা কর।

অধ্যায়–বার

বাংলাদেশের সম্পদ

প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া সব বস্তুকেই প্রাকৃতিক সম্পদ বলা হয়। মানুষ প্রকৃতি থেকেই এ সব সম্পদ আহরণ করে। এর ফলে মানুষের অর্থনৈতিক এ সামাজিক জীবনের অগ্রগতি ঘটে। প্রাকৃতিক সম্পদ পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করলে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো যায়।

পাঠ–১ : বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ

প্রকৃতির মধ্যে নানা মূল্যবান সম্পদ রয়েছে। যেমন পানি, বায়ু, মাটি, গাছপালা, জীবজন্তু, ফসল, খনিজ দ্রব্য ইত্যাদি। এসব প্রাকৃতিক বস্তুকে মানুষ নিজেদের চাহিদা মতো রূপান্তরিত করে ও কাজে লাগায়।

এই অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করব।

১. **মাটি** : মাটি বাংলাদেশের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। এদেশের সমতল ভূমি খুবই উর্বর। বেশির ভাগ এলাকায় বছরে তিনটি ফসল উৎপন্ন হয়। দেশের ১০ ভাগের এক ভাগ অঞ্চল পাহাড়ি এলাকা। পাহাড়ে প্রচুর প্রাণিজ, বনজ ও খনিজ সম্পদ রয়েছে।

২. **নদ-নদী** : বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এদেশে ছোট-বড় অনেক নদী আছে। নদীগুলো মাল পরিবহন ও যোগাযোগের সহজ মাধ্যম। নদীর পানি-প্রবাহ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। এছাড়া বিপুল পরিমাণ মৎস্য সম্পদ রয়েছে আমাদের নদ-নদীতে।

৩. **খনিজ সম্পদ** : বাংলাদেশের মাটির নিচে রয়েছে নানা মূল্যবান খনিজ সম্পদ। এগুলোর মধ্যে কয়লা, গ্যাস, চুনাপাথর, চীনামাটি, সিলিকা বালি উল্লেখযোগ্য।

৪. **বনজ সম্পদ** : বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমাণ ২৪,৯৩৮ বর্গকিলোমিটার। দেশের মোট ভূ-ভাগের ১৬ ভাগ হচ্ছে বন। বনে রয়েছে মূল্যবান গাছপালা। এগুলো আমাদের ঘরবাড়ি ও আসবাব তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া বনে রয়েছে পাখি ও প্রাণি-সম্পদ। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য বনের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের আরও বেশি বনভূমি থাকা প্রয়োজন।

৫. **মৎস্য সম্পদ** : বাংলাদেশে অনেক নদ-নদী, খাল-বিল ও দেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর রয়েছে। এ সব খাল-বিল, নদ-নদীতে রয়েছে প্রচুর মিঠা পানির মাছ। এছাড়া সামুদ্রিক মাছও আমাদের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করছে। মাছ ধরে বহু মানুষ জীবিকা অর্জন করে।

৬. **প্রাণী সম্পদ** : আমাদের প্রাণী সম্পদের মধ্যে রয়েছে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগি প্রভৃতি। এগুলো গৃহপালিত প্রাণী। এছাড়া দেশে রয়েছে নানা প্রজাতির প্রচুর পাখি।

৭. **সমুদ্র সম্পদ**: বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চল জুড়ে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। সাগর তীরে গড়ে উঠেছে চট্টগ্রাম ও মংলা দুটি সমুদ্র বন্দর। সাগরের পানি থেকে আমরা লবণ উৎপন্ন করি। তাছাড়া সাগর থেকে আহরণ করি প্রচুর মাছ।

এগুলোই আমাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। যদিও জনসংখ্যার তুলনায় কোনো কোনো সম্পদ হয়ত যথেষ্ট পরিমাণে নেই। তবে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এগুলো ব্যবহার করতে পারলে সীমিত সম্পদ দিয়েই দেশ সমৃদ্ধ হতে পারে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের তালিকা তৈরি কর। এসব সম্পদ আমাদের জীবনকে কীভাবে সমৃদ্ধ করছে সে বিষয়ে একটি প্রতিবেদন লিখ।

পাঠ–২ : আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের ভূমিকা

বেঁচে থাকার জন্য মানুষ নানা রকম কাজ করে। এসব মানুষের অর্থনৈতিক কাজ। এই অর্থনৈতিক কাজের উপর ভিত্তি করেই সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠে।

প্রাচীন কালে মানুষ বন থেকে ফলমূল সংগ্রহ করত এবং পশু শিকার করে তার মাংস খেতো। তারপর তারা ফসল ফলাতে শেখে এবং কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা তৈরি করে। খাদ্য ও অন্যান্য পণ্য উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগকে কেন্দ্র করেই মানুষের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে মধ্যযুগ পর্যন্ত মানুষ যেসব সম্পদ ব্যবহার করেছে তার সবটাই ছিল প্রাকৃতিক। প্রকৃতির সম্পদকে রূপান্তর করে মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে তা ব্যবহার করেছে। আধুনিক কালে মানুষ কয়লা, লোহা, পাথর, স্বর্ণ, রৌপ্য, গ্যাস ইত্যাদি খনিজ পদার্থ উত্তোলন করতে শিখেছে। তারা প্রকৃতির সম্পদকে আরও দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করছে এর জন্য তৈরি করছে অনেক আধুনিক যন্ত্র । এ ভাবেই মানুষ নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে দ্রুত উন্নত করেছে।

বাংলাদেশের উন্নতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের ভূমিকা : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত। অন্যদিকে সম্পদের তুলনায় দেশের জনসংখ্যা অনেক বেশি। এ জন্য আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করতে হবে যথাযথ পরিকল্পনা করে।

উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি : আমাদের দেশটি কৃষিপ্রধান। এদেশের মাটিও খুব উর্বর। এই উর্বর মাটি যথাযথভাবে ব্যবহার করলে কৃষি উৎপাদন অনেক বেড়ে যাবে। আবার শিল্পায়নও করতে হবে পরিকল্পিতভাবে। কৃষিকাজে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করলে উৎপাদন বাড়বে এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে গ্রামে। ফলে কাজের জন্য তখন আর গাঁয়ের লোক শহরের দিকে ছুটবে না।

সুষম খাদ্যের অভাব পূরণ : গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি ও মৎস্য এই তিন ধরনের প্রাণিজ সম্পদেরই বর্তমানে দেশে ব্যবহার বেড়েছে। এর ফলে সুষম খাদ্যের অভাব পূরণ হচ্ছে। অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ খামার সৃষ্টির ফলে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে।

সেচ সুবিধা প্রদান : নদী-খাল-বিল-হাওড়ের পানি দিয়ে আমরা কৃষিজমিতে সেচ দিতে পারি। ফলে শুকনো মৌসুমেও কৃষি উৎপাদন অনেক বাড়ানো যায়।

শিল্পের উন্নয়ন ও ব্যবসার প্রচার : দেশের গ্যাস, কয়লা ও চুনাপাথর আমাদের জীবনযাত্রায় কাজে লাগছে। এভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার হচ্ছে এবং শিল্পের প্রসার ঘটছে।

বনজ সম্পদ : বাড়িঘর তৈরি ও আসবাবপত্র নির্মাণের জন্য আমরা বনজ সম্পদ ব্যবহার করি। আবার তাপমাত্রা কমানোর জন্য বনজ সম্পদ অত্যন্ত প্রয়োজন। পরিকল্পিতভাবে আমাদের বনজ সম্পদ আরও বাড়াতে হবে।

দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহার করলে দেশের কৃষি-শিল্প যেমন উন্নত হবে তেমনি মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ কীভাবে আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাবে?

পাঠ–৩ : বাংলাদেশে জীববৈচিত্র্য

জীববৈচিত্র্য: প্রকৃতির মধ্যে সব রকমের জীব যে নিয়মে বেঁচে থাকে তাকেই সংক্ষেপে জীববৈচিত্র্য বলা যায়। মানুষ, প্রাণী ও কীট-পতঙ্গসহ জীবজগৎ প্রকৃতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখেই বেঁচে থাকে। জলবায়ু ও তাপমাত্রার নানা পরিবর্তনের ফলে জীবজগতের বিভিন্ন প্রাণী ও তরুলতার জন্ম বা মৃত্যু ঘটে। লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর জলবায়ুতে যেসব প্রাণী বেঁচে ছিল তাপমাত্রা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাদের মধ্যে অনেক প্রাণীরই বিলুপ্তি ঘটেছে। প্রকৃতির মধ্যে সব প্রাণীর অস্তিত্ব, বংশবিস্তার ও বিবর্তন ভারসাম্যপূর্ণভাবে ঘটে চলেছে। প্রাণীরা একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। সবুজ গাছপালা বাতাসে যে অক্সিজেন ছড়িয়ে দিচ্ছে তা গ্রহণ করে প্রাণীরা বেঁচে থাকে। আবার প্রাণীদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন পায় গাছপালা। বনে বিভিন্ন প্রাণী একে অন্যকে শিকার করে বেঁচে থাকে। প্রাণীদের বংশবিস্তার ঘটে একই নিয়মে। ঘূর্ণিঝড়ে সুন্দরবনের প্রাণী ও গাছপালার ক্ষতি হয়, আবার প্রকৃতির নিয়মেই সুন্দরবন গাছপালা ও প্রাণীতে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্যের অবস্থা : বাংলাদেশে একসময় প্রচুর বনজঙ্গল, জীবজন্তু ও পশুপাখি ছিল। নিচু জলাভূমিতে ছিল প্রচুর জলচর প্রাণী। দেশের জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় জলাভূমি ভরাট করে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ও শহর নির্মিত হচ্ছে। জীববৈচিত্র্যের উপর যার খারাপ প্রভাব পড়ছে। ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট নির্মাণের ফলে পানি প্রবাহ ব্যহত হচ্ছে। ফলে জলচর প্রাণী ও মাছের বংশবিস্তারে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে।

ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ও শহর-গঞ্জ গড়ে ওঠার ফলে দেশে কৃষিজমি পরিমাণ কমে গেছে। যেখানে সেখানে শিল্প-কারখানা তৈরি হওয়ার ফলে কারখানার রাসায়নিক বর্জ্যে নষ্ট হচ্ছে জমির উর্বরতা। বেশি মানুষের জন্য বেশি খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করতে হচ্ছে। এর ফলে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে মাছ, পোকা-মাকড় ও পাখির বংশবিস্তার। তাতেও জীববৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে।

দেশের জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে গাছপালা, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য সম্পদের উপর চাপ পড়ছে। শহরে গ্যাস ও পানি সরবরাহ কমে গেছে। গ্রামাঞ্চলেও গাছপালা কমে যাওয়ায় সেখানেও তাপমাত্রা বেড়ে গেছে। জীববৈচিত্র্য আমাদের সচেতন ও সক্রিয় হতে নষ্ট হওয়ার পরিণতি আমাদের জন্য ভয়ঙ্কর হবে। এই বিপদ মোকাবেলায় এখনই আমাদের সচেতন ও সক্রিয় হতে হবে।

জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য করণীয়সমূহ:

১. জনসংখ্যা কমিয়ে আনতে হবে;

২. কৃষিজমি নষ্ট করা যাবে না;

৩. কৃষি উৎপাদনে জীববৈচিত্র্য রক্ষার নীতি অনুসরণ করতে হবে;

৪. অপ্রয়োজনে সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা যাবে না;

৫. স্বাভাবিক পানি প্রবাহ বন্ধ করা যাবে না;

৬. জলাধার নির্মাণ ও সংরক্ষণ করতে হবে;

৭. রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে নিয়ম মেনে চলতে হবে;

৮. খনিজ পদার্থ ব্যবহারে প্রাকৃতিক নিয়ম মানতে হবে;

৯. বনজ সম্পদ বাড়াতে হবে এবং দেশে আরও বন সৃষ্টি করতে হবে;

১০. পশু ও মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও বৃদ্ধি করতে হবে;

১১. জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য সরকারি ও ব্যক্তি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা গ্রহণ করতে হবে;

১২. মনে রাখতে হবে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সর্বোচ্চ হুমকির মুখে রয়েছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : বাংলাদেশে জীববৈচিত্র্যের বাস্তব অবস্থার চিত্র তুলে ধরে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

পাঠ– ৪ : বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্প

বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত শিল্প। দেশজ উৎপাদনে (GDP) এ খাতের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশি এবং বিদেশি উদ্যোক্তারা ইতোমধ্যে বাংলাদেশে বেশ কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক জীবনে যার ব্যাপক প্রভাব পড়ছে। নিচে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্পের বিবরণ দেওয়া হলো :

পাট শিল্প : ১৯৫১ সালে নারায়ণগঞ্জে আদমজি পাটকল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পাট শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। এ দেশে একসময় কৃষকের প্রধান অর্থকরি ফসল ছিল পাট। পাট বিক্রি করে কৃষক তার পরিবারের

টাকার চাহিদা পূরণ করত। বর্তমানে দেশে ৭৬ টি পাটকল আছে। একসময় পাটকলগুলো শুধু পাটের বস্তা উৎপাদন করত। এখন পাট দিয়ে নানা পণ্য-সামগ্রী উৎপাদনের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে, ভবিষ্যতে আরও হবে। বাংলাদেশ ২০০৯–২০১০ অর্থবছরে পাটজাত সামগ্রী বিক্রি করে ৩২ কোটি মার্কিন ডলার আয় করেছে।

বস্ত্র শিল্প : ১৯৭৪ সালে এদেশে মাত্র ৮টি বস্ত্রকল ছিল। বর্তমানে ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালি, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর বস্ত্র ও সুতাকল রয়েছে। বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে কম মূলধন ও অধিক শ্রমিক ব্যবহার করে এ শিল্পের উৎপাদন সম্ভব। শিল্পায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে বস্ত্র শিল্পের প্রাধান্য ছিল।

পোশাক শিল্প : সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। গত শতকের আশির দশকে এ শিল্পের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। অতি অল্প সময়ে এ শিল্পটি দেশের বৃহত্তম রপ্তানিমুখী শিল্পে পরিণত হয়েছে। দেশে বর্তমানে তিন হাজারেরও অধিক পোশাক শিল্প ইউনিট রয়েছে। এতে ৩০ লক্ষের অধিক শ্রমিক কাজ করছে। বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলোতে পোশাক রপ্তানি করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। ২০০৮–০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক থেকে ৫,৯১৯ মার্কিন ডলার আয় করেছে।

চিনি শিল্প : বাংলাদেশে প্রচুর আখের চাষ হয়। আখ থেকে চিনি ও গুড় তৈরি হয়। ১৯৩৩ সালে নাটোরের গোপালপুরে প্রথম চিনিকল প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন দেশে ১৭টি চিনিকল আছে। আমাদের চাহিদা অনুযায়ী চিনি দেশে উৎপাদিত হচ্ছে না। ফলে বাংলাদেশকে প্রতি বছর প্রচুর চিনি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। ২০০৭–০৮ সালে আমাদের চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৬৩.৮৪ হাজার মেট্রিক টন।

কাগজ শিল্প : ১৯৫৩ সালে চন্দ্রঘোনায় কর্ণফুলী কাগজের কল স্থাপিত হওয়ার মধ্য দিয়ে এদেশে কাগজ শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। স্থানীয় বাঁশ ও বেতকে ব্যবহার করে কাগজ উৎপাদন শুরু হয়। দেশে এখন সরকারি ও বেসরকারিখাতে বেশ কটি কাগজের কল রয়েছে। সরকারি পর্যায়ে কর্ণফুলী, পাকশী, খুলনা হার্ডবোর্ড ও নিউজপ্রিন্ট মিল ছাড়াও বেসরকারি পর্যায়ে বসুন্ধরা ও মাগুরা পেপার মিল উল্লেখযোগ্য কাগজ শিল্প প্রতিষ্ঠান।

সার শিল্প : কৃষি প্রধান বাংলাদেশে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যেই রাসায়নিক সার তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৬১ সালে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে প্রথম প্রাকৃতিক গ্যাসভিত্তিক সার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশে এখন ৬টি ইউরিয়া ও একটি টিএসপি সার কারখানা চালু আছে। বাংলাদেশের সারের চাহিদা পূরণের জন্যে এ কয়টি কারখানার উৎপাদন যথেষ্ট নয়। প্রতি বছর বিদেশ থেকে আমাদের প্রচুর সার আমদানি করতে হচ্ছে। ২০০৯–১০ অর্থবছরে বাংলাদেশকে প্রায় ৬৭ কোটি ডলার মূল্যের সার আমদানি করতে হয়েছে।

সিমেন্ট শিল্প : পাকা বাড়িঘর, দালান কোঠা তথা শহর নির্মাণে প্রচুর সিমেন্টের প্রয়োজন হয়। চুনাপাথর ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সমন্বয়ে সিমেন্ট উৎপাদিত হয়। ১৯৪০ সালে ছাতক সিমেন্ট কারখানা দিয়ে এদেশের সিমেন্ট শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে বড় ও মাঝারি আকারের ১২টি সিমেন্ট কারখানা রয়েছে। এসব কারখানায় দেশের মোট চাহিদার অর্ধেক সিমেন্ট

উৎপাদিত হয়। বাকি সিমেন্ট আমাদের বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। ২০০৭–০৮ সালে দেশে ৩৯২২.৪৩ হাজার মেট্রিক টন সিমেন্ট উৎপাদিত হয়েছিল।

ঔষধ শিল্প : বাংলাদেশে বর্তমানে ঔষধ একটি সম্ভাবনাময় শিল্প হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এক সময় আমাদেরকে প্রচুর অর্থ খরচ করে বিদেশ থেকে ঔষধ আমদানি করতে হতো। এখন সরকারি–বেসরকারি উদ্যোগে বেশ কিছু ঔষধ কোম্পানি তৈরি হয়েছে যারা দেশের ব্যাপক ঔষধ চাহিদার অনেকটাই পূরণ করছে, একই সঙ্গে বিদেশে বেশ কিছু ঔষধ রপ্তানিও করছে। বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী শিল্প হিসেবে ঔষধের সম্ভাবনার কথা সকলেই এখন গুরুত্বের সঙ্গে ভাবছে।

চামড়া শিল্প : বাংলাদেশে প্রচুর গরু, ছাগল ও মহিষ পালন করা হয়। এদেশে বহু আগে থেকেই চামড়া বা ট্যানারি শিল্প গড়ে উঠেছে। জুতা ও ব্যাগ তৈরিতে চামড়া শিল্পের জুড়ি নেই। এখন বাংলাদেশে বেশ কিছু চামড়া শিল্প কারখানা তৈরি হয়েছে যারা দেশের গরু, ছাগল ও মহিষের চামড়া থেকে জুতা, ব্যাগসহ নানা উন্নতমানের জিনিসপত্র তৈরি করছে। কিছু কিছু কোম্পানি বিদেশেও তাদের উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করছে। ২০০৮–০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিদেশে জুতা রপ্তানি করে প্রায় ১৯ কোটি মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। আর ঐ বছর চামড়া বিক্রি করে আমাদের আয় হয়েছে ১৮ কোটি মার্কিন ডলার।

চা শিল্প : চা বাংলাদেশের অতি পুরাতন শিল্পের মধ্যে একটি। সিলেট অঞ্চলে প্রচুর চা উৎপাদিত হয়। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং দিনাজপুর অঞ্চলেও বর্তমানে চায়ের চাষ হচ্ছে। চা পাতা প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে তা পানের উপযোগী করা হয়। বাংলাদেশ নিজেদের চায়ের চাহিদা পূরণ করে বিদেশেও রপ্তানি করে থাকে। ২০০৮–০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ ১২০ লক্ষ মার্কিন ডলারের চা বিদেশে রপ্তানি করেছে।

এছাড়া বাংলাদেশে নানা ধরনের ছোট ও মাঝারি শিল্প রয়েছে। নতুন নতুন শিল্প-কারখানা তৈরি হচ্ছে। ঐসব কারখানা থেকে বিভিন্ন পণ্য-সামগ্রী তৈরি হচ্ছে যা আমাদের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : বাংলাদেশের শিল্পখাতের তালিকা প্রণয়ন করে এগুলোর গুরুত্ব চিহ্নিত কর।

পাঠ–৫ : বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিল্প

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিল্প : বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় অত্যন্ত দ্রুত শিল্পায়ন ঘটছে। নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার ঘটিয়ে মানুষ বিভিন্ন ধরনের পণ্য-সামগ্রী তৈরি করছে। সেইসব পণ্য নিয়ে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছে, জীবন-জীবিকা নির্বাহ করছে। শিল্পের বিকাশে মানুষের উদ্যোগ, পুঁজি এবং গবেষণা ও অভিজ্ঞতাই প্রধান ভূমিকা পালন করে। এখন সকল রাষ্ট্রই দ্রুত শিল্পায়ন ঘটানোর জন্যে উদার নীতিমালা প্রণয়ন করছে, দেশি বিদেশি শিল্পোদ্যোক্তাদের নিজ দেশে পুঁজি বিনিয়োগ ও শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। এর ফলে অর্থনীতিতে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটছে। অর্থনৈতিক উন্নতিই দেশের জনগণের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সহায়তা করে। সে কারণে দ্রুত দেশের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন বা উন্নতি ঘটাতে হলে শিল্প বিকাশের কোনো বিকল্প নেই। এমন কি কৃষি বা সেবা খাতেও

উন্নতি করতে হলে শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে। সেই সব খাতও এখন যন্ত্রপ্রযুক্তির ব্যবহারে ব্যাপকভাবে উন্নতি লাভ করছে। ফলে কৃষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থাও এখন শিল্পায়নের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে। শিল্প ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে এখন কৃষক অধিক ফসল ফলাচ্ছে, নিজের চাহিদাপূরণ করেও বাজারে ফসল বিক্রি করে নিজের অন্যান্য চাহিদা পূরণ করতে পারছে। ফলে সামাজিকভাবে কৃষকের জীবনব্যবস্থা এখন আগের চেয়ে অনেক নিরাপদ হয়ে উঠছে।

বাংলাদেশে শিল্প বিকাশের প্রভাব : বাংলাদেশে জনসংখ্যার চাপ অত্যন্ত বেশি। সব মানুষকে একমাত্র কৃষি স্বচ্ছলতা দিতে সক্ষম নয়। এ অবস্থায় কলে-কারখানায় কাজ করে শ্রমিক কর্মজীবীদের পরিবারের দারিদ্র্য ঘুচানো সম্ভব হচ্ছে। অনেকে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে ভালো বেতনে চাকরি করছে। এভাবে কৃষির বাইরেও অসংখ্য মানুষের জীবন–জীবিকা নির্বাহ করার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশে একমাত্র গার্মেন্টস শিল্পের সঙ্গেই এখন প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষ জড়িত আছে। এদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক হলো নারী- যারা নিজেদের দারিদ্র্যতা ঘোচাতে গার্মেন্টসে যুক্ত হয়েছে। তারা স্বাবলম্বী মানুষ হিসাবে গড়ে উঠেছে। অনেকেই কাজের পাশাপাশি লেখাপড়া ও প্রশিক্ষণ নিয়ে অধিকতর দক্ষতা অর্জন করছে। নিজেদের সন্তানদের তারা লেখাপড়ার মাধ্যমে যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে।

শুধু গার্মেন্টসে নয়, অন্যান্য খাতেও গ্রাম থেকে আসা লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের জীবিকার সংস্থান করছে। এভাবে শিল্প ও প্রযুক্তির সংস্পর্কে এসে তারা যেমন একদিকে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন করার চেষ্টা করছে, অন্যদিকে সামাজিকভাবেও তারা নতুন আবাসন, শিক্ষা, চিকিৎসা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে। এতে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। শহরে একেবারে দরিদ্রের চেয়ে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষকতা, আইন ব্যবসাসহ নতুন নতুন পেশায় মানুষ যুক্ত হচ্ছে। মানুষ এভাবে শিল্প ও প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে আর্থ-সামাজিক জীবনব্যবস্থা গড়ে তুলছে তাকে আমরা সংক্ষেপে আধুনিক জীবনব্যবস্থা বলছি। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো শিল্পের উন্নতি ঘটিয়েই উন্নত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। এখন শিল্প, তথ্য, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের দ্রুত প্রসার ঘটিয়ে আমরাও উন্নত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হবো।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : শিল্প বিকাশের প্রভাবের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মংলা একটি —

ক. স্থল বন্দর গ. বিমান বন্দর

খ. নদী বন্দর ঘ. সমুদ্র বন্দর

২. **গ্রামের লোক শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা হ্রাসের উপায় হচ্ছে—**

i . যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি
ii. কৃষিকাজে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার
iii. নতুন নতুন পেশার কর্মসংস্থান সৃষ্টি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i গ. i ও iii
খ. i ও ii ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

হাসান সাহেবের গাজীপুর জেলায় একটি বৃহৎ বাগান বাড়ি আছে। তাতে সেগুন, গজারীসহ নানা প্রজাতির গাছপালা আছে। তিনি মাঝে মাঝে সপরিবারে তার বাগান বাড়িতে বেড়াতে যান। তার ছোট্ট ছেলে লিমন সব ঘুরে ঘুরে দেখে। পাখির কিচির মিচির শব্দ শুনে সে খুব আনন্দিত হয়। সে বাসার তুলনায় এখানে বেশি ঠান্ডা অনুভব করে।

৩. **হাসান সাহেবের বাগানটি কোন প্রাকৃতির সম্পদের অন্তর্ভুক্ত?**

ক. বনজ সম্পদ গ. মৎস্য সম্পদ
খ. খনিজ সম্পদ ঘ. প্রাণি সম্পদ

৪. **আর্থ–সামাজিক অগ্রগতিতে উক্ত সম্পদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে—**

i . সুষম খাদ্যের অভাব পূরণ
ii. শিল্পের কাঁচামাল যোগান দেওয়া
iii. প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii গ. ii ও iii
খ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রতন তার বন্ধুদের নিয়ে ঘোড়াশালে একটি শিল্প কারখানা দেখতে এসেছে। সে এ শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার দেখতে পায়। একইসঙ্গে এ শিল্পের উৎপাদিত পণ্য দেশে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকার কথা জানতে পারে।

ক. কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পাট শিল্পের যাত্রা শুরু হয়?
খ. বাংলাদেশের বৃহত্তম রপ্তানিমুখী শিল্পটি বর্ণনা কর।
গ. রতনের দেখা শিল্পটির পরিচয় ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'রতনের অভিজ্ঞতায় কৃষকদের আর্থ–সামাজিক উন্নতির সাথে শিল্পায়নের সম্পর্ক ফুটে উঠেছে।'— এর যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

২. নাদিয়া তার বাবার সাথে ভোলা শহরের রাস্তা ধরে হাটছিল। হঠাৎ ভীড় দেখে কাছে গিয়ে জানল একটি টিউবওয়েল দিয়ে পানি পড়ছে। একটি ছেলে ম্যাচের কাঠিতে আগুন ধরিয়ে টিউবয়েলের কাছে ধরার সাথে সাথেই সেখানে আগুন জ্বলে ওঠে। নাদিয়ার প্রশ্নের জবাবে বাবা বললেন, মাটির নিচ থেকে এক ধরনের বায়বীয় পদার্থ পানির সাথে মিশেছে বলেই এ ঘটনা ঘটেছে। তিনি আরও বললেন উক্ত বায়বীয় পদার্থটি গৃহস্থালি ও কলকারখানার জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ক. বাংলাদেশের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ কোনটি?
খ. মৎস্য সম্পদের সাথে জীবিকা অর্জনের সম্পর্ক বর্ণনা কর।
গ. নাদিয়ার দেখা সম্পদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উক্ত সম্পদের প্রাচুর্যই দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সহায়ক, এ বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দাও।

অধ্যায়–তের

বাংলাদেশ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থা

পৃথিবী নামের আমাদের এ গ্রহটিতে রয়েছে মোট ১৯৬টি দেশ। দেশগুলো বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত। তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম হলেও, আজকের দুনিয়ায় কোনো দেশের পক্ষেই অন্যের সহযোগিতা ছাড়া একা চলা সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এমন কি রাজনৈতিক দিক দিয়েও দেশগুলো একে অপরের উপর কমবেশি নির্ভরশীল। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও নিজেদের উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের পরস্পরের সহযোগিতা নিতে হয়। যেমন একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশের খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের একার পক্ষে এগুলোর সমাধান সম্ভব নয়। এর জন্য অন্য দেশ ও সংস্থার সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। একইভাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশেরও রয়েছে অনেক সমস্যা। সকলের সহযোগিতার মাধ্যমে এসব সমস্যার সমাধান ও একটি শান্তিময় বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে পৃথিবীতে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থা। এর মধ্যে কতগুলো গড়ে উঠেছে নির্দিষ্ট অঞ্চলকে ঘিরে, অর্থাৎ ঐ অঞ্চলের দেশগুলোকে নিয়ে। যেমন : সার্ক, আসিয়ান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আফ্রিকান ইউনিয়ন প্রভৃতি। আবার কতগুলোর বিস্তৃতি ঘটেছে বিশ্ব জুড়ে। যেমন : জাতিসংঘ, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, ওআইসি প্রভৃতি। বর্তমান অধ্যায়ে বিশ্বের প্রধান কয়েকটি আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থা নিয়ে আলোচনা করা হলো।

পাঠ–১ ও ২ : জাতিসংঘ

গত শতাব্দীতে পৃথিবীতে দুই দুটি মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে অনেকগুলো দেশ জড়িয়ে পড়ে। প্রথম যুদ্ধটি চলে ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়টি ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত। দুটি যুদ্ধেই অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়, বহু শহর-জনপদ ধ্বংস হয়। মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রা থমকে দাঁড়ায় এ দুটি যুদ্ধের ফলে। যুদ্ধের ভয়াবহতা, নিষ্ঠুরতা ও ধ্বংসের ব্যপকতা দেখে সারা পৃথিবীর চিন্তাশীল মানুষ ও রাষ্ট্রনেতারা বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁরা ভাবতে থাকেন কীভাবে পৃথিবীকে যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করা যায়। আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে দেশগুলোর মধ্যকার বিরোধ মীমাংসা এবং তাদের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁরা একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০ সালে গঠিত হয় লীগ অব নেশনস বা জাতিপুঞ্জ। কিন্তু বিভিন্ন দেশের স্বার্থপরতার কারণে এ সংস্থাটি স্থায়িত্ব লাভ করে নি। যুদ্ধের বিপদ থেকেও তা পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারে নি। ফলে ১৯৩৯ সালে ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এ যুদ্ধের ভয়াবহতা ছিল আগেরটির চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। যুদ্ধের শেষ দিকে ১৯৪৫ সালের ৬ই ও ৯ই আগস্ট জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে আমেরিকার ফেলা আণবিক বোমার আগুনে পুড়ে দুই লক্ষেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। আহত ও পঙ্গু হয় আরও কয়েক লক্ষ মানুষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপক ধ্বংসলীলা দেখে বিশ্ববাসী শংকিত ও হতবাক হয়ে যায়। এ অবস্থায় যুদ্ধ চলাকালেই ১৯৪১ সালে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কেউ কেউ একটি নতুন ও অধিকতর শক্তিশালী আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। যা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল এবং আমেরিকা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের সঙ্গে অন্যান্য দেশের নেতৃবৃন্দের দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার ফলে ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য

নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলোকে সামনে রেখে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল :

১. আন্তর্জাতিক শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ;
২. বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করা ;
৩. আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিশ্বের সকল বিরোধ নিষ্পত্তি করা ;
৪. জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিশ্বের সব মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষা করা;
৫. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

জাতিসংঘের গঠন

জাতিসংঘের মোট ছয়টি অঙ্গসংগঠন রয়েছে। নিচের ছক থেকে আমরা সেগুলোর নাম জেনে নিই।

জাতিসংঘ
↓
সাধারণ | নিরাপত্তা পরিষদ | অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ | অছি পরিষদ | আন্তর্জাতিক আদালত | জাতিসংঘ সচিবালয়

শুরুতে ৫০টি দেশ নিয়ে জাতিসংঘ গঠিত হয়েছিল। বর্তমানে এর সদস্যসংখ্যা ১৯৩। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে এর সদর দপ্তর অবস্থিত। জাতিসংঘের মহাসচিব হচ্ছেন এর প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা। নরওয়ের অধিবাসী ট্রিগভেলি ছিলেন জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব। বর্তমান মহাসচিবের নাম বান কি মুন। তিনি দক্ষিণ কোরিয়ার অধিবাসী। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে।

জাতিসংঘের সদর দপ্তর

জাতিসংঘের পতাকা

জাতিসংঘের একটি নিজস্ব পতাকা রয়েছে। এর রং হালকা নীল। মাঝখানে সাদার ভিতরে বিশ্বের বৃত্তাকার মানচিত্র। এর দুপাশে দুটি জলপাই পাতার ঝাড়। জলপাই পাতা শান্তির প্রতীক।

জাতিসংঘের পতাকা

জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গের গঠন ও কাজ সম্পর্কে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

১। **সাধারণ পরিষদ :** জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রই সাধারণ পরিষদের সদস্য। সাধারণ পরিষদে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের একটি করে ভোট আছে। সাধারণত বছরে একবার সাধারণ পরিষদের অধিবেশন বসে। প্রত্যেক অধিবেশনের শুরুতেই সদস্যদের ভোটে পরিষদের একজন সভাপতি নির্বাচিত হন।

সাধারণ পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাসহ মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। এছাড়া মহাসচিব নিয়োগ, নতুন সদস্য গ্রহণ, বাজেট পাশ, সদস্য রাষ্ট্রগুলোর চাঁদার হার নির্ধারণ, নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যসহ বিভিন্ন সংস্থার সদস্য নির্বাচন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এ পরিষদ করে থাকে।

২। **নিরাপত্তা পরিষদ :** এ পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যা ১৫ । এর মধ্যে পাঁচটি স্থায়ী সদস্য। বাকি ১০টি অস্থায়ী সদস্য, প্রতি দুই বছর অন্তর সাধারণ পরিষদ সদস্যদের ভোটে যারা নির্বাচিত হয়। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলো হলো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স ও গণচীন। স্থায়ী সদস্যরা প্রত্যেকে ভেটো ক্ষমতার অধিকারী। এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে পরিষদের যে কোনো সিদ্ধান্তকে তারা একাই বাতিল বা স্থগিত করে দিতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা করে। এ চেষ্টা ব্যর্থ হলে পরিষদ সামরিক শক্তি প্রয়োগও করতে পারে। বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রধান দায়িত্ব এ পরিষদের উপর ন্যস্ত।

৩। **অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ :** এই পরিষদের সদস্যসংখ্যা ৫৪ । বছরে কমপক্ষে দুবার নিউইয়র্ক বা জেনেভায় এর অধিবেশন বসে। প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে যে কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ পরিষদের কাজ হলো সদস্য দেশগুলোর মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, বেকার সমস্যার সমাধান, শিক্ষার প্রসার, মানবাধিকার কার্যকর করা প্রভৃতি। এছাড়া বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক বিষয়ে সাধারণ পরিষদের কাছে সুপারিশ প্রেরণ করাও এ পরিষদের অন্যতম দায়িত্ব।

৪। **অছি পরিষদ** : নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য ও নির্বাচিত অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে অছি পরিষদ গঠিত।

অছি পরিষদ জাতিসংঘের হয়ে বিশ্বের অনুন্নত অঞ্চলসমূহের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করে। অছিভুক্ত অঞ্চলের উন্নতি এবং এলাকার অধিবাসীদের স্বাধীনতা রক্ষা ও তাদের দেশ শাসনের উপযুক্ত করে গড়ে তোলাই হচ্ছে অছি পরিষদের দায়িত্ব।

৫। **আন্তর্জাতিক আদালত** : এটি জাতিসংঘের বিচারালয়। পনেরজন বিচারক নিয়ে এ আদালত গঠিত। নেদারল্যান্ডের হেগ শহরে এটি অবস্থিত। জাতিসংঘের যে-কোনো সদস্য রাষ্ট্র যে-কোনো আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার জন্য আন্তর্জাতিক আদালতের কাছে বিচার প্রার্থনা করতে পারে।

৬। **জাতিসংঘ সচিবালয়** : জাতিসংঘের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে এটি গঠিত। এর প্রধান কর্মকর্তা হলেন মহাসচিব। তিনি সাধারণ পরিষদ কর্তৃক পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

জাতিসংঘের সকল প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করে এর সচিবালয়। এর কতগুলো বিভাগ বা শাখা রয়েছে যার মাধ্যমে সচিবালয় তার কাজ করে থাকে।

বিশ্বশান্তি রক্ষায় জাতিসংঘের অবদান

এর আগে আমরা জেনেছি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক সংস্থাটি বিশ্বশান্তি রক্ষায় কাজ করে আসছে। যুদ্ধ-সংঘাত বিশ্বশান্তির প্রধান প্রতিবন্ধক। তাই বিশ্বের কোথাও যুদ্ধ বা সামরিক সংঘাত বাধলে জাতিসংঘ তা বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়। কখনো কখনো যুদ্ধ বন্ধে জাতিসংঘ তার শান্তিরক্ষী বাহিনীকেও সংঘাতপূর্ণ এলাকায় পাঠায়। এছাড়াও বিশ্ব থেকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা দূর করা; মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, পরিবেশ দূষণজনিত সমস্যা মোকাবেলা, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধ, নারী ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমেও জাতিসংঘ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখছে। এর জন্য জাতিসংঘের রয়েছে কতগুলো বিশেষ সংস্থা। যেমন 'ইউনেস্কো' কাজ করে শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য। 'ইউনিসেফ' শিশুদের কল্যাণের জন্য। 'ফাও' খাদ্য ও কৃষির উন্নতির জন্য। 'হু' স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতির জন্য। বাংলাদেশের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানেও জাতিসংঘের এসব সংস্থা সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা দিচ্ছে। আবার সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশও জাতিসংঘের বিভিন্ন কার্যক্রমে সহযোগিতা করছে। যেমন আমাদের সেনা ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পৃথিবীর কোনো কোনো অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে।

নিচে আমরা জাতিসংঘের কয়েকটি বিশেষ সংগঠন যারা বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরছি।

ক. ইউনেস্কো

এটি জাতিসংঘের একটি সামাজিক সংস্থা। পুরা নাম 'দি ইউনাইটেড নেশন্স এডুকেশনাল সায়েন্টিফিক এ্যান্ড কালচারাল অরগানাইজেশন' অর্থাৎ জাতিসংঘ শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা। ১৯৪৬ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে এর সদর দপ্তর অবস্থিত। বর্তমানে ১৮৯টি রাষ্ট্র ইউনেস্কোর সদস্য। ইউনেস্কোর প্রধান লক্ষ্য হলো শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। পৃথিবীর সব মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার, আইনের শাসন ও মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে ইউনেস্কো কাজ করে যাচ্ছে। ইউনেস্কোর মূল কাজের ক্ষেত্র চারটি-শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও যোগাযোগ।

বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের ২৭শে অক্টোবর ইউনেস্কোতে যোগ দেয়। ১৯৭৩ সালে সরকার বাংলাদেশ ইউনেস্কো কমিশন গঠন করে। এ কমিশন বাংলাদেশে ইউনেস্কোর কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংস্থাটিকে সহায়তা করে। ইউনেস্কো বাংলাদেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বিশেষ করে বয়স্কদের শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ইউনেস্কোর উদ্যোগেই আমাদের ভাষা শহিদ দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে সারা বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এছাড়া বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সুন্দরবন ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য (যেমন বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ ও পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার) সংরক্ষণেও ইউনেস্কো সহায়তা করছে।

খ. বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (ফাও)

সংস্থাটির পুরা নাম 'দা ফুড এ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন অফ দি ইউনাইটেড নেশনস'। এটি ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭টি দেশ এর সদস্য। সংস্থাটি সারা বিশ্বে ক্ষুধার বিরুদ্ধে কাজ করছে। ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূরীকরণের মাধ্যমে বিশ্বে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জনগণের জীবনমান উন্নয়ন হচ্ছে ফাও-এর প্রধান লক্ষ্য।

বাংলাদেশ ফাও-এর একটি সদস্য রাষ্ট্র। ঢাকাতে এর শাখা অফিস আছে। বাংলাদেশের খাদ্য ও কৃষির উন্নয়নে ফাও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। উপরন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রায়ই আমাদের দেশে খাদ্য সংকট দেখা দেয়। এই সমস্যার মোকাবেলায় একটি খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ফাও সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়। এছাড়াও ফাও খাদ্যদ্রব্য সরবরাহে সহায়তা ও কৃষির উন্নয়নে পরামর্শ দিয়ে থাকে। জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় সহায়তা করে। ঝড় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদে ও প্রান্তিক চাষিদের প্রযুক্তিগত সহায়তাও দেয় সংস্থাটি।

গ. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিও এইচ ও)

সংস্থাটির পুরা নাম 'দি ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন'। এটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনস্বাস্থ্য রক্ষায় একটি সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে। ১৯৪৮ সালের ৭ই এপ্রিল এটি গঠিত হয়। সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে এর সদর দপ্তর অবস্থিত। বিশ্বের সকল অংশের মানুষের জন্য সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিত করাই সংস্থাটির লক্ষ্য।

বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশ থেকে সংক্রামক ব্যাধি দূর করতে সাহায্য করছে। শিশুদের ৬টি ঘাতক রোগ (হাম, ডিপথেরিয়া, টিটেনাস, যক্ষ্মা, পোলিও, হুপিং কাশি প্রভৃতি) প্রতিরোধেও সংস্থাটি অবদান রাখছে। এছাড়া দেশ থেকে ম্যালেরিয়া দূরীকরণ, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার কমানোর জন্যও কাজ করছে সংস্থাটি। ঘাতক রোগ কলেরা ও ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অবদান উল্লেখযোগ্য।

ঘ. জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ)

সংস্থাটির পুরা নাম 'ইউনাইটেড নেশনস ফান্ড ফর পপুলেশন একটিভিটিজ'। এটি ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদর দপ্তর নিউইয়র্কে । বিশ্বের ১৪০টিরও বেশি দেশ ইউএনএফপিএ-র সদস্য। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে ইউএনএফপিএ তার কাজকর্ম পরিচালনা করে থাকে। উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তাদের জনসংখ্যা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানই হচ্ছে ইউএনএফপি–এর মূল লক্ষ্য। এটি জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে দেশগুলোকে জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা করে ।

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশ। এই অতিরিক্ত জনসংখ্যা বাংলাদেশের জন্য এক বিরাট সমস্যা। এ সমস্যা মোকাবেলায় ইউএনএফপিএ দীর্ঘদিন যাবত বাংলাদেশকে সহযোগিতা করছে। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে এগিয়ে নেয়া, মহিলাদের ক্ষমতায়ন প্রভৃতি বিষয়েও ইউএনএফপিএ বাংলাদেশ সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা দিচ্ছে। ইউএনএফপিএ–র সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পপুলেশন সায়েন্স বিভাগ চালু হয়েছে। এ বিভাগটি দেশ ও বিশ্বের জনসংখ্যা সম্পর্কিত জ্ঞানদানের পাশাপাশি এ বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : বাংলাদেশে ইউনেস্কোর উন্নয়নমলক কর্মকাণ্ড দেশকে এগিয়ে নিতে কী ভূমিকা পালন করছে মল্যায়ন কর।

কাজ–২ : বাংলাদেশে খাদ্য সমস্যা সমাধানে ফাও–এর ভূমিকা মূল্যায়ন কর ।

কাজ–৩ : বাংলাদেশের জনসংখ্যা মোকাবেলায় ইউএনএফপিএ–র অবদান মূল্যায়ন কর ।

পাঠ–৩ : অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা

ক. জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (ন্যাম)

কোনো সামরিক জোটের সদস্য নয় বিশ্বের এমন স্বাধীন ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সংগঠন এটি। ১৯৬১ সালে তখনকার যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট যোশেফ ব্রজ টিটো, ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু ও মিসরের প্রেসিডেন্ট গামাল আবদেল নাসেরের উদ্যোগে এটি গঠিত হয়। বর্তমানে বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি দেশ এর সদস্য। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে গঠিত 'ন্যাটো' ও তৎকালীন

সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে গঠিত 'ওয়ারশ' সামরিক জোটের প্রভাবের বাইরে থেকে নিরপেক্ষ দেশগুলোর এই সংগঠনটি কিছুদিন আগে পর্যন্ত বিশ্বে শক্তির ভারসাম্য রক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। কয়েক বছর পর পর সদস্য দেশগুলোর কোনোটিতে ন্যাম এর শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সদস্য দেশগুলোর সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানরা উপস্থিত হয়ে আন্দোলনের নীতি ও করণীয় নির্ধারণ করে থাকেন।

বাংলাদেশ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। প্রথম থেকেই বাংলাদেশ এর সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে আসছে। ন্যাম-এর মূলনীতি ও উদ্দেশ্যের প্রতি বাংলাদেশ দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ। বদলে যাওয়া পৃথিবীতে এখন জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের গুরুত্ব আর আগের মতো না থাকলেও, এর নীতিমালা বাস্তবায়ন একটি শান্তিময় বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

খ. ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি)

বিশ্বের মুসলমান প্রধান দেশগুলোর একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন হলো ওআইসি বা ইসলামি সম্মেলন সংস্থা। এর সদস্য সংখ্যা ৫৭। এর সদর দপ্তর সৌদি আরবের জেদ্দায়। এর প্রধান লক্ষ্য হলো সদস্য দেশগুলোর মধ্যেকার ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার মাধ্যমে মুসলিম প্রধান দেশগুলোর স্বার্থরক্ষা, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সারা পৃথিবীর মুসলমানদের কল্যাণে কাজ করা। মুসলমানদের জন্য সংকটময় এক পরিস্থিতিতে ১৯৬৯ সালে ইসলামি সম্মেলন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এর নাম বদলে হয়েছে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা। মুসলিম বিশ্বের সমস্যা নিরূপণ এবং তা সমাধানের উপায় বের করা ওআইসির মূল লক্ষ্য।

বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে ওআইসির সদস্যপদ লাভ করে। প্রথম থেকেই ওআইসির সদস্য হিসাবে বাংলাদেশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। অন্যদিকে বাংলাদেশও ওআইসি ও তার সদস্য দেশগুলোর কাছ থেকে বিভিন্ন সহযোগিতা পাচ্ছে। তেলসমৃদ্ধ ওআইসিভুক্ত দেশগুলোতে জনশক্তি রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে, যা আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। গাজীপুরে অবস্থিত ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনলজি ওআইসি-র অর্থ সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী ও গুরুত্বপূর্ণ মসজিদগুলো সংরক্ষণেও ওআইসি আর্থিক সহযোগিতা দিচ্ছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ-১ : বিশ্বের শক্তির ভারসাম্য রক্ষায় ন্যাম কী ভূমিকা পালন করে?

কাজ-২ : ইসলামি দেশগুলোর ঐক্য ও সংহতি রক্ষার পাশাপাশি ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার কার্যাবলি লেখ।

পাঠ–৪ ও ৫ : আঞ্চলিক সহযোগী সংস্থা

ক. ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)

১৯৫৭ সালে পশ্চিম ইউরোপের ছয়টি দেশের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে এই আঞ্চলিক সংস্থাটি গঠিত হয়। দেশগুলো হলো বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, লুক্সেমবার্গ ও নেদারল্যান্ড। বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যসংখ্যা ২৭। বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে এর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। দেশগুলোর মধ্যে অভিন্ন বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে বাণিজ্য ও অর্থনীতির উন্নয়ন এর প্রধান লক্ষ্য। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত দেশের নাগরিকেরা পাসপোর্ট ও ভিসা ছাড়াই ইউনিয়নভুক্ত সকল দেশে যাতায়াত করতে পারে। ফলে সহজেই এক দেশের মানুষ অন্যদেশে গিয়ে লেখাপড়া, ব্যবসা ও চাকরির সুযোগ পাচ্ছে। এছাড়া ইইউ দেশগুলোর মধ্যে একক মুদ্রা চালু হয়েছে, যার নাম 'ইউরো'। এর ফলে দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সহজ হয়েছে।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাহী বিভাগের নাম ইউরোপীয় কমিশন (ইসি)। এটি ইইউ-এর পক্ষে দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করে। অর্থাৎ নীতি বাস্তবায়ন, তহবিল বরাদ্দ ও ব্যয়ের কাজ করে। ইসি সার্বিকভাবে ইইউ-কে প্রতিনিধিত্ব করে।

খ. আফ্রিকান ইউনিয়ন

সংস্থাটির পুরা নাম অর্গানাইজেশন অব আফ্রিকান ইউনিটি (ওএইউ)। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০২ সালে। কেবল মরক্কো ছাড়া আফ্রিকা মহাদেশের সকল দেশ এর সদস্য। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ৫৩। ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবাতে ওএইউ–র সদর দপ্তর অবস্থিত। এটি গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো : (১) আফ্রিকার দেশগুলো ও তাদের জনগণের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা (২) দেশগুলোর স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুরক্ষিত করা (৩) দেশগুলোর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন (৪) দেশগুলোতে গণতন্ত্র, সুশাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং (৫) আফ্রিকা মহাদেশে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা।

গ. আসিয়ান

এটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত দেশগুলোর একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। পুরা নাম এসোসিয়েশন অফ সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশনস অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় জাতিসমূহের সংস্থা। এর সদস্যসংখ্যা ১০। দেশগুলো হলো ইন্দোনেশিয়া, সিংগাপুর, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ব্রুনাই, ভিয়েতনাম, মায়ানমার, কাম্পুচিয়া ও লাওস। এর সদর দপ্তর ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায়। আসিয়ান-এর প্রধান লক্ষ্য হলো সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসন এবং দেশগুলোর সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি উন্নয়নে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা করা।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ–১ : ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রধান সদস্যদেশগুলোর নাম লিখে তাদের প্রধান দুটি কাজের উল্লেখ কর।

কাজ–২ : আফ্রিকান ইউনিয়ন গঠনের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো লেখ।

কাজ–৩ : আসিয়ানের সদস্যদেশ কয়টি ও কী কী? আসিয়ানের উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আন্তর্জাতিক আদালত কোথায় অবস্থিত?

ক. জেনেভা গ. নিউইয়র্ক
খ. নেদারল্যান্ড ঘ. প্যারিস

২. নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের ভেটো ক্ষমতা আছে বলে তারা—

i. যেকোন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে।
ii. নিরাপত্তা পরিষদের গৃহীত সিদ্ধান্ত বাতিল বা স্থগিত করতে পারে।
iii. যে কোনো বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i গ. i ও ii
খ. ii ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

হানিফ সাহেবের প্রতিবেশী শামীম সাহেবের বাচ্চা হামে আক্রান্ত হয়। তিনি বাচ্চাটিকে দেখতে গিয়ে জানতে পারেন শামীম সাহেব তার বাচ্চাকে টিকা দেয় নি। হানিফ সাহেব তখন তাকে জানায় যে মারাত্মক ৬টি রোগের টিকা বিনামূল্যে বাচ্চাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য দেওয়া হয়। তিনি সময়মত টিকা দেওয়ায় তার বাচ্চাদের এসব রোগ হয় নি।

৩. হানিফ সাহেবের বাচ্চাদের সুস্থ্য রাখার মূলে যে সংস্থাটি কাজ করছে—

ক. ইউনেস্কো গ. ইউনিসেফ
খ. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঘ. বিশ্ব খাদ্য সংস্থা

৪. উক্ত সংস্থা কর্তৃক এই প্রকল্প গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য কী?

ক. বিশ্বের সকল মানুষের জন্য সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিত করা
খ. বিশ্বের গ্রামীণ ও দরিদ্র দেশগুলোকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেওয়া
গ. তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা
ঘ. উন্নত দেশ কর্তৃক দরিদ্র দেশকে স্বাস্থ্যগত সুবিধা দেওয়া

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সীমান্ত নিয়ে 'ক' ও 'খ' রাষ্ট্রের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলে আসছিল। 'ক' রাষ্ট্র তার সামরিক বাহিনী নিয়ে 'খ' রাষ্ট্রের ভূ-খন্ডে আগ্রাসি তৎপরতা চালায়। 'খ' রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে সাহায্য চাইলে বিবাদমান রাষ্ট্রের বিরোধ মীমাংসায় সংস্থাটি এগিয়ে এসে সমাধান করে দেয়। এই সংস্থাটি বিশ্ব থেকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা নিরসন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করছে।

ক. ইউনেস্কোর মূল কাজের ক্ষেত্র কয়টি?
খ. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কোনটি? এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
গ. 'ক' ও 'খ' রাষ্ট্রের বিবাদ মীমাংসায় কোন সংস্থাটি কাজ করেছে—ব্যাখ্যা কর।
ঘ. বিশ্ব শান্তি রক্ষায় উক্ত সংস্থাটি প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে—এই প্রস্তাবনার পক্ষে যুক্তি দাও।

২. পিয়াল টিভিতে ন্যাশনাল জিওগ্রাফি চ্যানেলে বাংলায় অনুষ্ঠান সম্প্রচার দেখে বিস্মিত হয়। সে খোঁজ নিয়ে জানতে পারে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে পরিণত হওয়ায় এই কার্যক্রম চলছে। একটি বিশেষ আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাভাষাকে এই মর্যাদাদানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। তার স্কুলে ঐ সংস্থার সহযোগিতায় একটি বিজ্ঞান গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে। অতি সম্প্রতি একটি ইন্টারনেট ক্লাবও গঠন করা হয়েছে।

ক. জলপাই পাতা কিসের প্রতীক?
খ. অছিভুক্ত এলাকা বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর।
গ. পিয়ালের বিদ্যালয়ে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতা রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. পিয়ালের বিদ্যালয়ের কার্যাবলির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে উক্ত সংস্থার ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

সমাপ্ত

২০১৩
শিক্ষাবর্ষ
৮–বা বি

শিক্ষাই দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে পারে
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিশ্রম উন্নতির চাবিকাঠি

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :